

১৫৲
পরিণীতা
১ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা, মে ২০১৪
মাসিক বিনোদন
প্রেতলোকে উঁকিঝুঁকি
ঘুরে আসি: অমরনাথ
মনপসন্দ সরবত
ব্যাটেল ব্রাজিল
ফ্যাশন: দেবশ্রী



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অর্ণব জ্যোতি পাল

স্ক্যান ঃ অভিজিত ব্যানার্জী

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

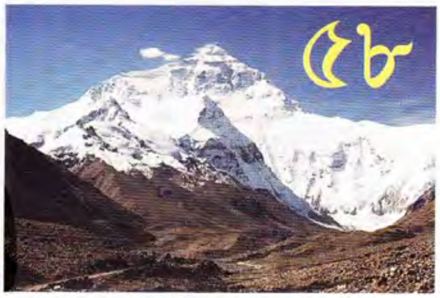
আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com




Rakhi

সূচিপত্র



সম্পাদক: তাপস রঞ্জন ঘোষাল
কার্যনির্বাহী সম্পাদক: গার্গী ঘোষাল

প্রচ্ছদ মডেল: অনিন্দিতা
পোশাক : একাকন্যা শাড়িজ (033-06500-6200)
মেক আপ: শম্ভুনাথ ভৌমিক (9088316671)
ফোটো: সুমন্ত মুখার্জী (9830858485)

ভ্রম সংশোধন: গত সংখ্যায় প্রকাশিত রঘুনাথ ব্যানার্জীর সাক্ষাতকারে ওনাকে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। যা সক্রিয় সামাজিক কর্মী হবে।

Published, Printed and Owned by: Bobby Ghosal
Edited by : Tapas Ranjan Ghosal
57, Prasanna Kumar Dutta lane, P.O & P.S : Shibpur
Howrah, Pin : 711102, West Bengal.

For Editorial, Advertisement, Subscription Circulation, Feedback & any other queries
kindly mail on: ganapatimp2012@gmail.com
Address: 57, Prasanna Kumar Dutta lane, P.O & P.S : Shibpur . Howrah, Pin : 711102, West Bengal.
Contact : 9163559667 / 7685825124

বিপণনঃ কে কে পুরী নিউজ
ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাঃ লিঃ
৯, ডেকার্স লেন, কলকাতা-৬৯
ফোনঃ (০৩৩) ২২১০১১৩৬

PARINITA 1 MAY 2014 REGISTERED KOL,
RNI NO: WBBEN/2013/51971 INR 15.00



চিঠিপত্র

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,
আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন। প্রথম সংখ্যা থেকেই 'পরিণীতা' দেখছি। ভালো লাগছে। বিষয়ের অভিনবত্ব অসাধারণ। পরিণীতা ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে উঠছে তাই আরও ভালো লাগছে।
শুভেচ্ছা রইল,
রাজ কুমার শেখ
বেলডাঙা।

উ: আপনাদের পত্রিকাটি আরও ভালো লাগুক। এই প্রচেষ্টায় আমরা আছি।

'পরিণীতা'র সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার প্রথম থেকেই। আমি বিভিন্নরকম ম্যাগাজিন পড়তে ভালোবাসি। কিন্তু এখন ক্রমেই আমি 'পরিণীতা'-র নিয়মিত পাঠিকা হয়ে উঠছি। আর আমার বন্ধুরাও আমার অনুরোধে পরিণীতা পড়তে শুরু করেছে। ব্যাপারটি আমার কাছে বেশ আনন্দের।
ইতি
পায়েল সাহা
সুভাষগ্রাম।

উ: পরিণীতা যে আপনাদের কাছে আনন্দের সম্ভার এতেই আমরা আনন্দিত।

'সস্তার তিন অবস্থা।' প্রচলিত এই কথাটি নস্যাৎ করেছে 'পরিণীতা'। শুধু কম দামে ভালো পত্রিকাই নয়। পরিণীতা মাত করে দিয়েছে আমাদের মতো পাঠক-পাঠিকাদের মন। সাহিত্যের টুকিটাকির সঙ্গে বিনোদনের উপাদানও একস্ট্রা লাভের মতো। তাই কামনা করি পরিণীতা সকলকে টেক্কা দিয়ে আমাদের হৃদয় জুড়ে থাক।
ইতি
আমজাদ আলি হালসানা
বাঙালঝি, নদিয়া

উ: পরিণীতা আপনাদের হৃদয় জুড়েই থাকুক। আমাদেরও এই একান্ত কামনা।

হাতের মুঠোয় পরিণীতা পেয়েই সমস্ত পাতা এক নিঃশ্বাসেই উল্টে ফেলি। ধন্দে পড়ে যাই কোনটা ছেড়ে কোনটা আগে পড়ি। তবে 'ভালো থাকুন' বিভাগটি আমার মন সহজেই কেড়ে নেয়।
নমস্কারান্তে
আইভি রায়।
দমদম।

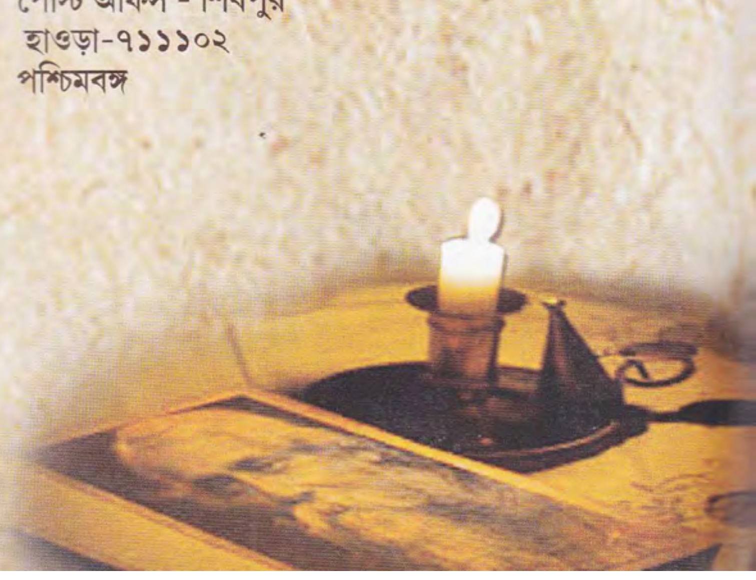
উ: এইভাবেই পাশে থাকুন।

প্রতি মাসেই পরিণীতার সঙ্গে আমার দেখা হয়। বিভিন্ন রূপে সে আমাকে মজিয়ে দিয়েছে। আমি এই পত্রিকাটির সঙ্গে পাঠক হিসেবে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে গিয়েছি।
শুভাকাঙ্ক্ষী
পল্লব সেন
গড়িয়া

উ: খুব ভালো লাগল পত্রিকাটি সম্পর্কে আপনার মনোভাব। দেখতে থাকুন। পড়তেই থাকুন।

চিঠির উত্তর দিচ্ছেন সম্পাদক

চিঠি পাঠাবার ঠিকানা:
৫৭, প্রসন্ন কুমার দত্ত লেন
পোস্ট অফিস - শিবপুর
হাওড়া-৭১১১০২
পশ্চিমবঙ্গ



সম্পাদকীয়

ভোট, আই পি এল আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গরম। সম্পাদকীয় কলম লিখতে বসে ভাবছিলাম কি দিয়ে শুরু করবো? দিল্লির মসনদ কার দখলে যাবে সর্বভারতীয় মিডিয়া এখন সেই নিয়ে ব্যস্ত। খবরের কাগজে, চ্যানেলে এখন তুমুল ভোটের হাওয়া। তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে সর্বভারতীয় বাৎসরিক ক্রিকেট উৎসব আই পি এল। সময় কেটে যাচ্ছে বেশ। বাসে ট্রামে ট্রেনে, কলেজে বা রেস্তোরাঁয় আলোচনার বিষয়েরও কোনও কমতি নেই। তবে একথা মানতেই হবে সচিন সৌরভ রাহুল কুম্বলেদের অভাব পুরণ করতে ভারতীয় ক্রিকেটের এখনও সময় লাগবে। ভোটের প্রতিদিনকার তর্ক যুদ্ধ অবশ্য তুলনায় রঙিন। সর্বত্র এখন একটাই আলোচনা মোদি না রাহুল, কংগ্রেস না বিজেপি কার হাতে যাবে আগামি পাঁচ বছর এই দেশের রাজদণ্ড? উত্তর সময়ের হাতে। আমাদের মতো খুব সাধারণ মানুষদের একটাই আশা দিল্লির গদি যার দখলেই যাক, ‘একটু দেখবেন স্যার। বড় কষ্টে আছি।’ তেলের দাম, গ্যাসের দাম, আনাজের দাম প্রতিদিনই অলিম্পিকের গোল্ড মেডেলিস্টের মত লাফানোর রেকর্ড করছে। সরকারি কোনও কাজই বাঁ হাত ছাড়া ডান হাতে হয়ে উঠছে না। গরিব বাড়ির বাচ্ছাটা আজও সকালে না খেয়ে রয়েছে। স্কুলে যাওয়া এখনও ওই ফুটপাথের ছেলেমেয়েগুলোর কাছে স্বপ্ন। মেট্রো রেল, গ্রিন করিডোর, সোনালি চতুর্ভুজে দেশের গতি বৃদ্ধি হয়েছে মানছি, শুধু মাঝে মাঝে বুঝে উঠতে পারছি না তুমুল গতিতে যাচ্ছি কোনদিকে, সামনের দিকে না পিছনের দিকে? এখনও চ্যানেল খুললেই রোজকার নারী নির্যাতনের রির্পোট, এখনও খবরের কাগজে প্রতিদিন নাবালিকার বিয়ে বা পাচারের আর্টিকেল। তাই ওই একটাই অনুরোধ ‘একটু দেখবেন স্যার, মানুষ খুব কষ্টে আছে, স্পেশালি মেয়েমানুষ।’

পরিণীতার নববর্ষ সংখ্যা পাঠকদের ভালো লেগেছে জেনে আমরাও খুব খুশি। আপনাদের ফোন আর চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সঙ্গে আছেন বলেই আমরাও এগিয়ে যাচ্ছি, না হলে পিছনে টানার তো লোকের অভাব নেই। এভাবেই সঙ্গে থাকুন, আর হ্যাঁ এই প্রচণ্ড গরমে অবশ্যই শরীরের যত্ন নিন। আর একটা অনুরোধ অবশ্যই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। মনে রাখবেন আমাদের ভাগ্য কিন্তু আমাদের হাতেই। ভালো থাকুন।

গার্গী ঘোষাল



গার্গী ঘোষাল
কার্যনিবাহী সম্পাদক

প্রচ্ছদ কাহিনি

প্রেতলোকে উঁকিঝুঁকি



যা কিছু অলৌকিক, যা কিছু ভৌতিক, যা কিছু পারলৌকিক-সবকিছুর প্রতিই আমাদের একটা সহজাত কৌতূহল আছে। এই সব নিয়ে চর্চার স্বাভাবিক প্রবণতা সময়ের অপব্যয় না বুদ্ধির অপচয়কে প্রশ্রয় দেয় সেটা অন্য কথা। কিন্তু দরকারি এই কথাটাও জানা দরকার যে কিছু বিশ্বাসী মানুষের এইগুলি নিয়ে আগ্রহী চর্চা বরাবরই চলে। প্ল্যানচেট তেমনই এক বিষয় যার সঙ্গে মিশে আছে পরলোক, প্রেত, বিদেহী প্রভৃতি ব্যাপারগুলি। লিখলেন

প্রীতম সেনগুপ্ত

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগত: স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ।।
শ্রীমদ্ভগবদগীতা ২/২৩-২৪।

হিন্দুশাস্ত্রের উচ্চতম ভাবনার বা লক্ষ্যের নির্যাস গীতার এই শ্লোকেই সম্যকভাবে পাওয়া যায়, বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো। লক্ষ্য হল আত্মজ্ঞান বা যথার্থভাবে আত্মার স্বরূপকে বোঝা। আর এই জ্ঞান যিনি অর্জন করতে পেরেছেন বা পারবেন তাঁদের কাছে মৃত্যু কোনও ভয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে না। মৃত্যুর কোনওরকম প্রভাব তাঁদের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে না। এই শ্লোকটির অর্থ হল --' অগ্নি তোমায় দাহ করতে পারে না, জল তোমাকে সিক্ত করতে পারে না, বায়ু তোমাকে শুষ্ক করতে পারে না, কোনও অস্ত্রই তোমাকে বিদ্ধ করতে পারে না, আসলে তুমি অমর অপরিবর্তনশীল, অনন্ত চিরন্তন।'

আসলে এ যেন কোনও রহস্য কাহিনির ক্লাইম্যাক্সটা জেনে নিয়ে কাহিনিটি আদ্যোপান্ত পড়ার তোড়জোড় করার মতোই। বিষয়টা প্ল্যানচেট এবং যেখানে আত্মা বিষয়টি একেবারে কি-এলিমেন্ট, সেখানে গীতার এই শ্লোক দিয়ে গৌরচন্দ্রিকা ওই ক্ল্যাইম্যাক্স জেনে নিয়ে রহস্য কাহিনি পড়তে বসাই তো! তবে প্ল্যানচেটের ক্ষেত্রে আত্মা শব্দের সঙ্গে আর একটি শব্দ যুক্ত থাকে সেটি হল প্রেত। প্রেত আর আত্মা এই দু'য়ে মিলে প্ল্যানচেটের সর্বেসর্বা হল এই প্রেতাত্মারাই। এই প্রেতাত্মাদের সঙ্গেই সংযোগ স্থাপনের বহুল পরিচিত পদ্ধতি প্ল্যানচেট, যাকে বহু বিদগ্ধজনেরা শুদ্ধ বাংলায় বলেছেন ' প্রেতাবতরণ-বৈঠক'। ব্যক্তিগতভাবে একটা কথা বলে রাখা ভালো আমি নিজে কোনওদিন প্ল্যানচেটে বসিনি। সুতরাং প্ল্যানচেট নিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা সত্যতা নিরূপণের মাপকাঠি কোনওটাই আমার নেই। আর পাঁচজনের মতো নেহাত কৌতূহল আর মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জিজ্ঞাসা নিয়েই প্ল্যানচেট নিয়ে মাথা ঘামানো। মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে জিজ্ঞাসা চিরকালের। দু'সেকেন্ড আগেও যে মানুষটা জীবিত ছিল সে হঠাৎ করে আর নেই, সেই শরীরী মানুষটিকে কোনওদিনই পৃথিবীর বুকে চলতে ফিরতে দেখা যাবে না- এ যেন এক পরম বিস্ময়। বাস্তবিক জন্মের একেবারের শুরুর কথা এবং পরপর জন্ম-বিকাশ-বিনাশ এই যে স্তরভেদ রয়েছে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণের মধ্যে তার মধ্যে আগাগোড়াই নিহিত আছে পরম বিস্ময়। এই বিস্ময়ের নিরসন নানাভাবে ঘটাতে চেয়েছেন বিদগ্ধজনেরা, নানা মুনির নানা মত এই নিয়ে। প্ল্যানচেট যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয় সেক্ষেত্রে আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। আবার সেই ভগবদগীতার (২/২২) দ্বারস্থ হয়েই একটি শ্লোকের উল্লেখ করতে হয়--

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নাবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি
দেহী।।

অর্থাৎ মৃত্যুতে জীবাত্মা জীর্ণবাসের মতো জীর্ণ জড়শরীর ত্যাগ করে এবং এটাই হল মৃত্যু। আর এই জায়গা থেকেই পুনর্জন্মবাদের কনসেপ্টের শুরু।

ওসব পুনর্জন্মটন্ম ঢপ, ঢপে মাথা ঘামিয়ে....

বছর দুই-তিনেক আগের কথা। এই বাংলার এক গায়ক-অভিনেতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল নানা বিষয় নিয়ে। ইনি বেশ ইন্টেলেকচুয়াল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'জন্ম তাহলে একটাই?' অনাবিল হেসে উত্তর দিলেন- 'হ্যাঁ আবার কী? ওসব পুনর্জন্মটন্ম ঢপ, ঢপে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই।' আরেক স্বঘোষিত ঈশ্বর- আত্মা ইত্যাদিতে ঘোরতর অবিশ্বাসী অত্যন্ত প্রথিতযশা সাহিত্যিক দৃঢ় বিশ্বাস থেকে জানালেন, 'আমাদের যা কিছু অনুভূতির জন্য দায়ী মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বা লোব (Lobe)। এর মধ্যে কোনও ঈশ্বর নামে বড়বাবুর অস্তিত্ব নেই। ওই মস্তিষ্কই সব কিছুর জন্য দায়ী।' তবে একটা কথা বলে নিতে হয় যে, পৃথিবীর দুই গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম- ইহুদি ধর্ম (এই ধর্ম থেকেই ক্রমপরিণতির ফলে উদ্ভূত খ্রিস্টান ও মুসলমান ধর্ম) এবং জরথ্রুস্টীয় ধর্ম একজন্মবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু প্ল্যানচেট বা পরলোকচর্চা যাই হোক না কেন, ইওরোপ ও আমেরিকায় এই নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই। মতবাদের, ভাবনার বিভিন্নতা যতই বাড়ে মানবসভ্যতার ভিতর, সেইসব নিয়ে আগ্রহ বা চর্চাও পাশাপাশি বেড়ে চলে। তাই একটা স্থির বিন্দুতে নিজের বা নিজেদের বিশ্বাস কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি সবসময়ের জন্য গ্রথিত রাখতে পারে না। অর্থাৎ কূপমণ্ডুকতা যেমন সভ্যতার একটা দোষ , আবার সেই কূপমণ্ডুকতার বদ্ধ দেওয়ালকে ভেঙে দিয়ে জানবার প্রবল ইচ্ছাও এই মানব সভ্যতাতেই ওতপ্রোতভাবে নিহিত। সেটা ভাল-মন্দ, উঁচু নিচু যে ধরনেরই হোক না কেন। তাই মূল প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলি যে, একটা বিষয় লক্ষ্য করা গিয়েছে অত্যাধুনিক প্রেততত্ত্ববাদের সামনে খ্রিস্টানদের নরকাগ্নিবাদ অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা অনন্তকাল দুঃখ, কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য ইত্যাদি ধ্যান ধারণাগুলি প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। প্রেততত্ত্বের ইতিবাচক দিক হিসেবে আমরা এই বিষয়ে অবগত হই যে, আমাদের 'বিদেহী' বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনদের আত্মারা এই সংবাদটা জানাতে ভীষণভাবে আগ্রহী থাকে যে তারা যেখানে আছে সেখানে ভালোই আছে, সুখেই আছে। শুধু তাই নয়, আমাদের কাজকর্মের ব্যাপারেও তাদের ভয়ানক আগ্রহ থাকে এবং এই বিষয়ে নানা সৎ পরামর্শ দেওয়ার জন্যও তাদের ঔৎসুক্য লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্ত বিপদ আপদ ভবিষ্যতে আমাদের জীবনকে আক্রান্ত করতে পারে,



সেইসবের হাত থেকে রক্ষা করতেও এরা উদ্যোগী থাকে। অর্থাৎ এই পৃথিবীর জড়জগতের অন্তরালে , আপাত ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও প্রিয়জনদের মায়া এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না বিদেহীদের পক্ষে। আর সেই জায়গাটাই প্ল্যানচেটের সুবিধাজনক দিক। এ যেন অনেকটা মার্কেটিংয়ের মতো। হয়তো কোনও প্রোডাক্টের চাহিদা একটা বিশেষ অঞ্চলে খুব বেশি। সেই প্রোডাক্টকে বিক্রি করতে গেলে বা ক্রেতার হাতে তুলে দিতে গেলে ওই অঞ্চলটিকেই চিহ্নিত করতে হবে এবং সেই জায়গার চাহিদাটাকে কাজে লাগাতে হবে। প্রেতাবতরণ বৈঠক বা প্ল্যানচেটের ক্ষেত্রে সেলস বা মার্কেটিং এক্সিকিউটিভদের মতো একজন পাকাপোক্ত মিডিয়ামকে বুঝে নিতে হয় যে প্রেতাত্মা বা বিদেহীদের এক বিরাট অংশ এই পৃথিবীর সঙ্গে সবসময় সংযোগ স্থাপনে ইচ্ছুক।

> প্রেত বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী, মিডিয়ামকে সহায় করে প্ল্যানচেটে আধা-জাগরণ অবস্থায় থাকা প্রেতাত্মারা (অনেকেই) মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতেই শান্তিময় ঘুম ছেড়েও পার্থিব স্তরে নেমে আসতে বাধ্য হয়। কোনও কোনও প্রেতাত্মা আবার নিজেরাই স্বেচ্ছায় নেমে আসার জন্য উৎসুক থাকে। তারা আসে বা আত্মপ্রকাশ ঘটায় সম্পূর্ণ ঘুমের অবস্থায়। এমনও নাকি দেখা গিয়েছে যে, মিডিয়ামের যে পথ দিয়ে প্রেতাত্মারা নামে, সেটা খোলা থাকলে তারা আর সংযত থাকতে পারে না, ভিড় করে নেমে আসার জন্য।

দুটি জরুরি প্রশ্ন

কয়েক মাস আগের ঘটনা। আমার পরিচিত এক মহিলা মারা গেলেন। মারা যাওয়ার সংবাদ শুনে ওঁর বাড়িতে গেলাম। বাড়ির বারান্দায় শায়িত রয়েছে তাঁর মরদেহ। বছর সাড়ে তিন চারের এক নাতনি রয়েছে ওঁর। সে তার বাবার কোলে উঠে অবিরত কেঁদে চলেছে এবং ক্রমাগত সেই এক প্রশ্ন 'বাবা, দিদুনের কী হয়েছে?' অবোধ বালিকার সেই প্রশ্নের কী উত্তর দেবে তার বাবা? স্বভাবতই তাকে অসহায় লাগছিল। শেষমেশ শিশুটিকে শান্ত করতে তিনি বললেন, দিদুন ওই যে দূরের আকাশের তারাগুলো ঝিকমিক করছে সেইরকম একটি তারা হয়ে গিয়েছে। সরল বালিকা এরপর শান্ত হয়ে গেল, সে একটা পরিণতির কথা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরে আর অস্থির হয়ে উঠল না। তার দিদুন আকাশের তারা হয়ে গিয়েছে এটা জেনে তার কান্নাও থামল। মৃত্যু নিয়ে এই প্রশ্ন যেমন চিরকালই উঠেছে নানাভাবে, তেমনি প্রেতচর্চায় আগ্রহীদের মনে দুটি প্রশ্ন প্রাথমিকভাবেই ঘুরপাক খায়ই। প্রথম প্রশ্নটা হল - প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কি সংযোগ স্থাপন সম্ভব? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন- বিদেহী প্রেতাত্মারা কি আবার দেহ ধারণ করতে পারে? পরলোকচর্চায় অগ্রণীদের কী মত সেটা জানবার আগে আমার নিজস্ব দুটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। একটি চোখে দেখা, অন্যটি শোনা। কোনও এক পিরের মাজারে ঘটনাটি দেখা। সেখানে একটি লোক সেও একজন পিরের মতোই, ঝাড়ফুঁক করত, ভূত তাড়াতো। মাজারের পরিবেশটি বেশ সুন্দর। সব ধর্মের মানুষই সেখানে আসেন, আমিও একসময়ে প্রায় নিয়মিতই যেতাম। একদিন দেখলাম একটি সদ্য বিবাহিত হিন্দুবাড়ির গ্রাম্য বউ এসেছে। তাকে নাকি ভূতে ধরেছে। গ্রামাঞ্চলে মাঠে জঙ্গলে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারার অভ্যাস আছে মানুষের। এই বউটিও কোনও এক সকালে একটি নিরিবিলি গাছের তলায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যায়। সেই সময়ই ভূতটি তাকে ধরে। কেমন সেই ভূতে ধরার ব্যাপার সেটা একটু বলি। দেখলাম সেই পির সাহেব ক্রমাগত ঝাঁটাপেটা করছেন বউটিকে, মাঝেমধ্যে বোতল থেকে মাজারের পবিত্র জলও ছিটিয়ে দিচ্ছেন বউটির সারা গায়ে। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলছেন-'এ্যাই আমার কথা শুনছিস না। যা, যা বলছি এর কাছ থেকে।' এবার বউটির উত্তর দেওয়ার সময় চমকে উঠলাম। একেবারে পুরুষ কণ্ঠস্বর। সেই পুরুষ কণ্ঠস্বরে বউটি বলছে- ' যতদিন না অমুকের ওপর শোধ নেব, আমি একে ছাড়বনি।' এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁটা পেটা পিরের। বউটি (সেই পুরুষ কণ্ঠস্বরে) আঁতকে উঠে বলে- 'আরে পির সাহেব মেরোনি, দাও দিকি একটা বিড়ি'। এটা শুনে দারুণ মজা পেলাম। পির সাহেব বললেন-'অ্যা বিড়ি খাবি? ঠিক আছে এক বান্ডিল দেব, কথা দে ছেড়ে দিবি।' বিড়ি দেওয়া হল বউটিকে। সে আয়েশ করে বিড়ি ধরিয়ে রীতিমতো স্টাইল করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। তারপর কী হয়েছিল জানি না। কারণ বেশিক্ষণ ওখানে ঘটনাটা দেখার সময় হাতে ছিল না। কিন্তু ভূতে ধরার কেস সেই প্রথম চাক্ষুষ করা। মোদ্দা কথায় যেটা বোঝা গেল, কোনও ভাবে বউটির প্রাণসত্তাটিকে দখল করে বসে আছে ওই পুরুষ ভূতটি। কেন বউটিকে সে বেছে নিল সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু প্ল্যানচেটের ক্ষেত্রে একজন মিডিয়ামের ভূমিকাটি অনেকটা এই বউটির মতো। পার্থক্য একটাই যে মিডিয়াম স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে প্রেতাত্মার আহ্বান করে আর এই বউটি সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থাতেই ভূতের খপ্পরে পড়েছে। প্রেত বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী, মিডিয়ামকে সহায় করে প্ল্যানচেটে আধা-জাগরণ অবস্থায় থাকা প্রেতাত্মারা (অনেকেই) মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতেই শান্তিময় ঘুম ছেড়েও পার্থিব স্তরে নেমে আসতে বাধ্য হয়। কোনও কোনও প্রেতাত্মা আবার নিজেরাই স্বেচ্ছায় নেমে আসার জন্য উৎসুক থাকে। তারা আসে বা আত্মপ্রকাশ ঘটায় সম্পূর্ণ ঘুমের অবস্থায়। এমনও নাকি দেখা গিয়েছে যে, মিডিয়ামের যে পথ দিয়ে প্রেতাত্মারা নামে, সেটা খোলা থাকলে তারা আর সংযত থাকতে পারে না, ভিড় করে নেমে আসার জন্য। এবার আসা যাক, বিদেহীদের দেহধারণের প্রশ্নটিতে। এই বিষয়ে আমার শোনা একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। যার কাছ থেকে শুনেছিলাম তিনি কোনওভাবেই মিথ্যা বলার লোক নন। অন্তত আমায় বলবেন না। অভিজ্ঞতাটি এক মহিলার। তাঁর কাছ থেকেই শোনা। এই মহিলারা চার ভাই বোন। সকলের বড় ইনিই। তাঁর যখন দশ বছর বয়স সেই সময় মা মারা যান। ভাইবোনেরা আরও ছোট ছোট। এমতাবস্থায় জ্যাঠা-জ্যাঠাইমা'র কাছে মানুষ হন তাঁরা। তাঁদের নিজেদেরও দুই সন্তান ছিল। স্বাভাবিকভাবেই সেই মহিলার কাছে বহুবার শুনেছি যে ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য কী প্রচণ্ড স্যাক্রিফাইস করেছিলেন এই দম্পতি। দেব-দেবীতুল্য জ্যাঠা-জ্যাঠাইমা তাঁর জীবনে ছিল অনেক কিছু। যাই হোক তাঁর এই জ্যাঠামশাই সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। দুপুরে ঘুমোচ্ছিলেন, ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু। ডাক্তার এসে জানায় সেকেন্ডের ভগ্নাংশিক সময় নাকি নিয়েছে তাঁর প্রাণবায়ু বের হতে। যন্ত্রণাহীন এমন মৃত্যু খুব কমই দেখা যায়। একজন যথার্থ সৎ লোকের উপযুক্ত মৃত্যু। ঘটনাটা ঘটল কাজের দিন অর্থাৎ শ্রাদ্ধের দিন। বাড়ির সকলেই ভীষণ ব্যস্ত সকাল থেকেই। স্থানীয় মানুষজনের কাছেও ভীষণ জনপ্রিয় ছিলেন মানুষটি। ফলে বহু লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে সকাল থেকেই। তখন সকাল সাড়ে আটটা-নটা বাজে। হঠাৎই রান্নাঘর থেকে শোনা গেল জ্যাঠাইমার চিৎকার। পড়িমড়ি করে বাড়ির সকলে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু যারা একেবারে

শুরুতেই গিয়ে পৌঁছেছিল তারাই দেখতে পেয়েছিল ব্যাপারটি। এদের মধ্যে এই মহিলাও ছিলেন। রান্নাঘরটা তখন ঝাঁট দিয়ে সবে মোছা হয়েছে। আগেকার দিনের সেই লাল মেঝে। তাতে স্পষ্ট পায়ের ছাপ। একেবারে সেই জ্যাঠামশাইয়ের পায়ের ছাপ। জ্যাঠাইমার কাছ থেকে যেটা জানা গেল, সেটা হল রান্নাঘরে ঢোকা মাত্রই তাঁর মনে হয় যে পিছনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন কেউ নেই। কিন্তু মেঝের দিকে দৃষ্টি যেতেই চক্ষু চড়কগাছ। একটার পর একটা পায়ের ছাপ পড়ছে, কেউ যেন হেঁটে যাচ্ছে অথচ তাঁর সমগ্র শরীরের কোনও অংশই দৃশ্যমান নয়। কিন্তু অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। জ্যাঠাইমা স্বাভাবিকভাবেই ভয়ে চিৎকার করে ফেলেন। যারা একেবারে শুরুতে গিয়ে পড়ে তাদের নজরে আসে পায়ের ছাপ পড়াটা। কিন্তু বেশি লোক এসে যাওয়ার পর ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যায়, পায়ের ছাপগুলিও দ্রুত মিলিয়ে যেতে থাকে।

আরেকটি ঘটনাও শোনা - এক প্রাচীন মহাপুরুষ সম্পর্কে। আশ্রমবাসী এই উচ্চকোটির সন্ন্যাসীকে সকাল-সন্ধে বহু মানুষই দর্শন করতে যেতেন। একটু শান্তির আশ্রয় পেতেই ত্রিতাপদগ্ধ সংসারী মানুষেরা আসতেন। এই সন্ন্যাসী মহারাজের দুই সেবক ছিলেন। সন্ধে সাড়ে ছ'টার পর দর্শন বন্ধ হয়ে যেত। গোটা বিষয়টিই দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন এই দুই সেবক। একদিন সাড়ে ছ'টা বেজে গিয়েছে। স্বভাবতই দর্শন বন্ধ। কিছুক্ষণ পরে তিন মহিলা এসে হনহন করে মহারাজের ঘরের দিকে এগোতে থাকলেন। সেবকরা বাধা দিয়ে জানালেন এখন ওঁর কাছে যাওয়া চলবে না কারণ দর্শনের সময় পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা সেবকদের কথায় কান না দিয়ে এগোতে থাকলেন। সেবকরা ক্রমাগত বারণ করে চলেছেন আর ওনারাও এগিয়ে চলেছেন। এরকম একটা অবস্থায় ঘরের ভিতর থেকে সেই সন্ন্যাসী মহারাজ গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিলেন, 'ওদের আটকিও না, আসতে দাও।' অগত্যা তাঁদের যেতে দিতেই হল। এরপর দুজন বাইরে অপেক্ষা করতে থাকলেন, তিনজন বাইরে বেরলেই সদর দরজা, গেট সব বন্ধ করে দেবেন। দশ মিনিট, পনের মিনিট, কুড়ি মিনিট, আধ ঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় কেটে গেল অথচ ওঁদের আর বের হওয়ার নাম নেই। সেবক দুজনের এবার সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। শেষমেশ ঘরের ভিতর ঢুকে বোকা বনে গেলেন তাঁরা। দেখলেন কারোর চিহ্ন মাত্র নেই সেই ঘরে, শুধুমাত্র সন্ন্যাসী মহারাজ একাই বসে আছেন। সেবকরা এপাশ-ওপাশ তাকাতে থাকলেন। সন্ন্যাসী মহারাজ শুধু আস্তে আস্তে বললেন, 'ঠিক আছে অত চিন্তা করার কিছু নেই, ওরা আমার কাছে মাঝে মাঝে আসে।' মহারাজের কথার ইঙ্গিতেই দুই সেবক বুঝে নিলেন যে এনারা আসলে ছিলেন তিন বিদেহী আত্মা, যাঁরা মহারাজের কাছে এসেছিলেন সাময়িকভাবে দেহধারণ করে।

প্রেততত্ত্ব অনুযায়ী, বিদেহী প্রেতাত্মাদের সূক্ষ্মদেহ মিডিয়ামের শরীর থেকে এক ধরনের বায়বীয় আকারের এক্টোপ্লাজমের মতো উপাদান সংগ্রহ করে জড়দেহ ধারণ করতে পারে। মিডিয়াম যখন সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় থাকে তখন



মিডিয়ামের প্রাণশক্তিকে সম্বল করে। কখনও এইসব দেহধারণ করা প্রেতাত্মাদের দেখতে পাওয়া যায় ছায়ার আকারে, আবার কখনও কখনও তারা চলাফেরাও করে, কথা বলে। এইসব ভৌতিক ছায়া শরীর আবার যে কেউই দেখতে পান না। যাদের মনের জোর খুব বেশি তারাই দেখতে পান। প্রেততাত্ত্বিকদের বহু গবেষণার ফল হিসেবে এটা প্রমাণিত সত্য হিসেবে উঠে এসেছে যে মিডিয়ামের শক্তিকে ধার করে প্রেতাত্মারা এই দুনিয়ায় সাময়িকভাবে দেহধারণে সক্ষম।

প্রেত লেখনী , শেক্সপিয়র এবং...

১৯৪৭ সাল। অটোমেটিক রাইটিং-এর ইতিহাসে একটা অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যায় এই বছর। অটোমেটিক রাইটিং হল পরলোক থেকে আত্মা বা প্রেতাত্মাদের মিডিয়ামের সাহায্যে সাহিত্য রচনা। হেস্টার ডাউডেন নামে এক মহিলাকে মিডিয়াম করে প্ল্যানচেট থেকে চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য উঠে আসে। ডাউডেন অটোমেটিক স্ক্রিপ্ট রচনায় বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যখন এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের সঙ্গে 'কনভারসেশনস'গুলি লিপিবদ্ধ করতেন তখন তাঁর পাশে থাকতেন পার্সি অ্যালেন নামের এক লেখক। এই 'সিঁয়াস'গুলির ফলস্বরূপ মি. অ্যালেন দাবি করেন তিনি এক চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কার করেছেন। কী সেই চাঞ্চল্যকর তথ্য? তা হল- শেক্সপিয়র আদতে কে? তিনিই কি ফ্রান্সিস বেকন? নাকি লর্ড অক্সফোর্ড? কিংবা এগুলির কেউই নন, উইলিয়ম শেক্সপিয়র নিখাদ উইলিয়ম শেক্সপিয়রই। গোটা বিষয়টি অদ্ভুত তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। মিসেস ডাউডেনের সঙ্গে যোগযোগকারী প্রেতাত্মাদের কাছ থেকে জানা যাচ্ছে শেক্সপিয়রের নাটকগুলি ছিল গ্রুপ এফর্ট বা দলগত প্রয়াস। এনাদের মধ্যে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন শেক্সপিয়র ও লর্ড অক্সফোর্ডের। এছাড়া ব্যুমোঁ ও ফ্লেচার অন্যান্য বিভিন্নধর্মী নাটক লিখে প্রসিদ্ধি পান। বেকন ছিলেন একজন কড়া সম্পাদক। আসলে যে যেটা ভাল পারতেন সেটাই করতেন মন দিয়ে। শেক্সপিয়র বিভিন্ন কমিক ও ট্র্যাজিক চরিত্রগুলি নির্মাণ করতেন, যেগুলি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। যেমন ইয়াগো ও ফলস্টাফ। নাট্য রচনায় তাঁর ছিল অসামান্য দক্ষতা। অন্যদিকে লর্ড অক্সফোর্ডের রচনার বিষয়বস্তু ছিল ক্যাবিক ও রোম্যান্টিক। মিসেস ডাউডেন এই তথ্যটি সম্পর্কে অবহিত হন যে, বেশিরভাগ সনেটের রচয়িতাই হলেন লর্ড অক্সফোর্ড। তিনি নতুন তিনটি সনেটও মিসেস ডাউডেনকে দিয়ে রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন। বেকন মিসেস ডাউডেনকে বারবার জানিয়েছেন সারা দুনিয়ার মানুষ যেগুলিকে শেক্সপিয়রের সাহিত্য বলে জানেন সেগুলি সবই আসলে দলবদ্ধ সৃষ্টি!

মিসেস ডাউডেন এই তথ্যটি সম্পর্কে অবহিত হন যে, বেশিরভাগ সনেটের রচয়িতাই হলেন লর্ড অক্সফোর্ড। তিনি নতুন তিনটি সনেটও মিসেস ডাউডেনকে দিয়ে রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন। বেকন মিসেস ডাউডেনকে বারবার জানিয়েছেন সারা দুনিয়ার মানুষ যেগুলিকে শেক্সপিয়রের সাহিত্য বলে জানেন সেগুলি সবই আসলে দলবদ্ধ সৃষ্টি!

চিকো জেভিয়ার- আত্মার কলমে বেস্ট সেলার

বিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত ও সাড়া জাগানো 'সাইকিক' রাইটার হচ্ছেন চিকো জেভিয়ার। যাঁর পুরো নাম ফ্রানসিসকো ক্যানডিডো (চিকো) জেভিয়ার। তিনি তাঁর 'মৃত লেখক'দের লেখার মাধ্যমে সারা ইওরোপ ও আমেরিকায় রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। ব্রাজিলীয় হওয়ার সুবাদে চিকোর ভাষা ছিল পোর্তুগিজ এবং তাঁর সেই 'ডিকটেটেড' ভাষা ছিল ভীষণ ব্যাকরণসম্মত ও পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। তাঁর লেখা সব চাঞ্চল্যকর বইগুলি ব্যবসায়িক দিক দিয়ে দারুণ সফলতার মুখ দেখে।



কিন্তু লাভের অঙ্ক হিসেবে প্রাপ্য অর্থ তিনি কোনও সময়েই নেননি। তাঁর যুক্তি ছিল, বইগুলির আসল লেখক যখন তিনি কোনও ভাবেই নন, সেক্ষেত্রে লাভের অঙ্কে ভাগ বসানোর কোনও প্রশ্নই নেই। টানা পঞ্চাশ বছর ধরে দিনপ্রতি অন্ততপক্ষে পাঁচ ঘণ্টা ধরে জেভিয়ার নানা মৃত লেখকের আত্মার ডিকটেট করা লেখা লিখে গিয়েছেন। চিকোর এইভাবে লেখা বইগুলির মধ্যে একটি বেস্ট সেলার বই হল 'প্যারান্যাসাস ফ্রম বিয়ন্ড দ্য টম্ব' নামে একটি কবিতা সমগ্র। ৪২১ পৃষ্ঠার বইটিতে বিভিন্ন ভাব ও চিন্তার মোট ২৫৯টি কবিতা ছিল। যে ৫৬ জন লেখকের সই নথিভুক্ত ছিল বইটিতে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন পোর্তুগিজ ভাষার খ্যাতনামা কবি ও পরলোকবাসী। কবিতাগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল প্রেম, পুরোহিত শ্রেণির ভণ্ডামি, হাস্যরস, মানুষের বিবর্তনের প্রকৃতি ইত্যাদি নানা বিষয়।
স্কুলে খুব অল্পদিনের জন্যই লেখাপড়া করেন চিকো। ফলে অতি সীমিত প্রাথমিক শিক্ষা ছিল। সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ছিলেন না, আবার পুরোপুরি শিক্ষিতও বলা যায় না। কিন্তু মিডিয়াম হিসেবে পরলোকগত লেখকের লেখা লেখবার সময় এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন যা অতি শিক্ষিতদের মাথাতেও অনেক সময় চট করে আসে না। অবশ্য তিনি সরাসরি স্বীকার করে নেন যে এইসব শব্দের অর্থ কিছুই বুঝতেন না, জানতেন না। ২৪৫৯ পৃষ্ঠার 'আওয়ার হোম' নামে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ তাঁর মাধ্যমে রচনা করেন ট্রপিকাল মেডিসিনের ডাক্তার অ্যান্ড্রি লুইজের আত্মা। গ্রন্থটি ন'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগেই মারা যাবে গল্পের নায়ক। তারপর এই মারা যাওয়া নায়ককে কেন্দ্র করে মরণোত্তর জীবনের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করেছেন লুইজ। তিনি লিখেছেন, 'এই জায়গাটা (?) অনেকটা পৃথিবীর মতোই।' আবার আর এক জায়গায় লিখছেন- 'মৃত্যু আসলে পোশাক বদলানোর মতো। আর স্বর্গ বা নরক তৈরি করি আমরা কর্মের মাধ্যমেই। পুরোহিত বর্ণিত স্বর্গের কোনও অস্তিত্ব নেই। আমরা ঈশ্বরের সন্তান। জীবনমৃত্যুচক্রের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ও পরিধির মধ্যে দিয়ে অর্জন করেছি এক ঈশ্বরীয় মূল্যেবোধ'।

প্রেতচর্চা ও স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ এমন এক সন্ন্যাসী যিনি প্রেতচর্চার অভিজ্ঞতালব্ধ বৈজ্ঞানিক দিকটি নানাভাবে তুলে ধরেছেন। এই সত্যান্বেষী, অনুসন্ধিৎসু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যের এই বিষয়ে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতাও রয়েছে। সেইসব অভিজ্ঞতার কিছু কিছু প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা যেতেই পারে। আমরা ক্রম অনুযায়ী সেইসব অভিজ্ঞতাগুলোকে সাজানোর চেষ্টা করলে প্রেতচর্চার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা সত্যতা বিষয়ে কিছুটা আভাস হয়তো পাব।
(ক) ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত লিলি- ডেলে এক আধ্যাত্মিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে আমি 'হিন্দুধর্ম' ও 'পুনর্জন্মবাদ' সম্বন্ধে বলি। একটা অডিটোরিয়ামে সভার আয়োজন হয়েছিল, তার চারদিক খোলা ছিল ও প্রেততত্ত্ববাদে বেশ আগ্রহশীল শ্রোতার দ্বারা আসনগুলি ভর্তি ছিল। একটা বাৎসরিক



উৎসব-দিন উপলক্ষে আমি ছিলাম বক্তা। টিকিট বিক্রয়ের সংখ্যা গণনা করে দেখা গেল যে, যেসব শ্রোতা শুনতে এসেছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল সাত হাজার। এই সভায় অনেক মিডিয়াম উপস্থিত ছিলেন। এঁদের কেউ কেউ আমায় বলেছিলেন যে, আমি যেসব কথা তাঁদের বলছি সেসব কথা তাঁরা তাঁদের এক প্রেতাত্মা নির্দেশকের কাছ থেকেও শিখেছেন। তাঁরা তাঁদের এক প্রেত-আহ্বায়ক বৈঠকে যাবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করলেন। ১৮৯৯-এর ৪ ঠা আগস্ট, এক বৈঠকে থেকে এক টাইপ রাইটারে আপনা আপনি টাইপ রাইটিং হতে দেখলুম। সকলেই আপন আপন মৃত আত্মীয় বন্ধুদের নাম দিলেন। আমিও আমার গুরুভাই যোগেনের নাম দিলাম। নীল পেন্সিলে লেখা যোগেনের নাম পাওয়া গেল। এতে আমার কৌতূহল জাগলো; কে লিখলেন আমার জানতে ইচ্ছা হল।
(খ) আর একটি বৈঠকে যোগেনকে সশরীরে দেখতে চেয়েছিলাম। সে তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিল। তবে লিলি-ডেলে মিসেস মসের এক বৈঠকে আমি ৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রিটের বলরাম বসুকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। জীবিত অবস্থার মতোই তিনি ঠিক তাঁর সেই সাদা পাগড়িটি পরেছিলেন। তবে তাঁর পাগড়িটি আরো উজ্বল

দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার মধ্যে ছোট ছোট ইলেকট্রিক বালব জ্বলছে। শ্মশ্রুগুম্ফিত গম্ভীর বদন আর জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে আমার চোখ ঝলসে গিয়েছিল। তিনি অবশ্য কোনও কথা বলেননি, তবে মাথা নেড়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। আমার মাথার ওপর ডান হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। মিডিয়াম মিসেস মসকে আমি তখন দোলক- চেয়ারে অজ্ঞান অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছিলাম। বলরামবাবু আমায় অশীর্বাদ করার পর কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেলেন।
আমি প্রথমে বুঝতে না পেরে আশ্চর্য হয়েছিলাম যে, কেন তিনি কথা বলেননি। পরে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ইহজীবন ত্যাগ করবার ঠিক আগেই তাঁর কথা বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনা আবার সমর্থিত হয়েছিল যখন আমি জেনেছিলাম যে, বলরাম বসু ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় এক সপ্তাহের বেশি কারোর সঙ্গে কথা কইতে পারেননি।

(গ) ... বিদেহী প্রেতাত্মাদের জড়দেহ-ধারণ ব্যাপারে অনেক মিথ্যা প্রতারণাও ইওরোপ আমেরিকায় ধরা পড়েছে। কিন্তু এমন সব সত্যিকারের ঘটনাও আছে যা আমি নিজের চোখে ওদেশে (পাশ্চাত্যে) প্রত্যক্ষ করেছি। এমনও হয়েছে যে, প্রেত বৈঠকের ভেতরে আমাকে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আমি গেছি এবং অনুভব করেছি যে, অন্তত প্রেতাত্মাদের কুড়িটা হাত আমার পিঠের ওপর অর্থাৎ কুড়িটা বিদেহীদের হাত আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করেছে। কেউ কেউ আমার জামার কলার কিংবা পকেট ধরে টানছে, কিংবা একইসঙ্গে অনেকগুলো হাত আমার পিঠে দিয়েছে। এসব আমি স্পষ্টভাবে অনুভব করেছি। তারপর একজন প্রেতাত্মা হয়তো আমায় জিজ্ঞাসা করল ঃ 'আপনি কি মনে করেন যে, মিডিয়ামই এইসব ব্যাপার করছে?' প্রেত- বৈঠকের ঘরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা ছিল, যদিও ঘরের কোণে কাঠের বাক্সে ঢাকা একটা আলো মিটমিট করে জ্বলছিল। আবার সেই একই গলার শব্দ এলো 'আপনি মিডিয়ামের গায়ে হাত দিন তো'। আমি দেবার আগেই দেখি সেই প্রেতাত্মা আমার হাতটা ধরে মিডিয়ামের গায়ে স্পর্শ করালো। আমি স্পর্শ করে দেখলাম মিডিয়ামের সমস্ত দেহটা একেবারে শক্ত মড়ার মতো অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছে। তার হাতদুটি শক্ত করে ফিতা দিয়ে বাঁধা ছিল। আমি যে প্রেতের হাতটা ধরেছিলাম সেটি ছিল একজন আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ানের। ধরার একটু পরেই সেই হাতটা আবার আমার হাতের মধ্যেই গলে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

(ঘ)... আমেরিকার সব ধরনের মিডিয়ামদের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েও এমন একজনকেও দেখতে পায়নি যে মৃত্যু পরবর্তী জীবন বা ব্যক্তি-আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বা বিশ্বাত্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার কোনও প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পেরেছে বরং আমার এইসব প্রশ্ন শুনে অনেক প্রেতাত্মাকে বলতে শুনেছি ঃ 'আমাদের চেয়ে আপনি নিজেই এসব প্রশ্নের ভালো উত্তর দিতে পারেন।' অনেক সময় অন্য কোনও প্রেত আবাহনকারীর প্রশ্নের জবাবে অনেক প্রেতাত্মা আমার দিকে ইঙ্গিত করেছে।
গত গ্রীষ্মকালে এক প্রেত আবাহনকারীর বৈঠকে আমার শুনে মজা লেগেছিল- মিডিয়ামের ওপর ভর করা এক প্রেতাত্মা উদয় হয়ে প্রথমেই বললঃ 'আরে, এখানে তো দেখছি এক চিন্তার বাক্স হাজির হয়েছে, তার সামনে কী করে কথা বলব?' তখনই বুঝতে পারিনি এর মানে, পরে দেখেছিলাম যে আমার দিকেই ইঙ্গিত করে এই অভিব্যক্তি করা হয়েছে।

মিডিয়াম বিষয়ে কিছু দরকারি কথা

মিডিয়াম হওয়ার ক্ষেত্রে একটা যৌথতায় বিশ্বাস বা আস্থা রাখা একান্ত প্রয়োজন। ইতিমধ্যে মিডিয়াম হিসেবে নিয়মিত যাঁরা অংশ নিচ্ছেন এবং যাঁরা মিডিয়াম হতে ইচ্ছুক তাঁদের মধ্যে একটি নিয়মিত বৈঠক বা ডেভেলপিং সার্কেল তৈরি হয়। একটি নির্দিষ্ট ঘরে সপ্তাহে অন্তত একবার নির্দিষ্ট সময়ে বৈঠক আহূত হয়। সময়কে নির্দিষ্ট রাখার বিষয়ে মিডিয়ামরা সচেতন থাকেন। কেননা এই জগতে দৈনন্দিন কাজেকর্মে তাঁদের যেমন ব্যস্ত থাকতে হয় এবং তার থেকে নির্দিষ্ট সময় খুঁজে বার করে বৈঠকে বসতে হয়, একইভাবে পরলোকের বিদেহী আত্মাদেরও কাজের শেষ নেই। তাদেরও নির্দিষ্ট সময়ের বাঁধনে আসতে পারলে সুবিধা হয়। যে ঘরটি বাছা হয় প্রেত বৈঠকের জন্য তাকে প্রেততত্ত্বানুশীলনের উপযোগী করে নিতে হয়। ঘরটির পরিবেশ একেবারে অনুকূল হলেই মিডিয়ামরা তাঁদের কাজকর্ম শুরু করতে পারেন। এই বৈঠক সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে করা প্রয়োজন। এটা সবসময় খেয়াল রাখা উচিত যে মিডিয়াম যখন পূর্ণ কার্যকরী অবস্থায় চলে যান তখন তাঁর দেহ ও মনের স্থির তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। বৈঠকে যাঁরা বসেন তাদের চিন্তাশূন্য একটি মনের অবস্থা তৈরি করত হয়



একাগ্রতার সঙ্গে। এর ফলে মনের মধ্যে যেন কোনও কিছুকে গ্রহণ করার অপেক্ষা তৈরি হতে থাকে। যেটাকে পরিভাষায় প্রেততাত্ত্বিকেরা বলছেন রিসেপটিভ অ্যাটিটিউড।
বৈঠক বা প্ল্যানচেটে ঘরটি অন্ধকার থাকার ফলে কোনও জড়বস্তু ইন্দ্রিয়গত হয়ে মনের একাগ্রতায় ব্যাঘাত ঘটায় না। বৈঠকে যোগ দিয়েছেন এমন এক মিডিয়াম কোনও কিছুই চিন্তা করবেন না, মনে কোনও রকম জিজ্ঞাসা তোলারও চেষ্টা করবেন না। বরং অদৃশ্য প্রেতের ইচ্ছাশক্তির হাতে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করবেন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে অচিরেই প্রেতাহ্বানের আশ্চর্য ফল পেতে থাকবেন।
মিডিয়াম হওয়ার কাজে যথাযথ ফল পাওয়া যায় তখনই যখন বৈঠকে যোগদানকারীরা প্রেত নিয়ন্ত্রণকারীদের ইচ্ছার ওপর নিজেদের দেহ, মন ও ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেন। ক্রমশই প্রেতশক্তি মিডিয়ামের ইচ্ছা, ইচ্ছাকৃত শক্তি ও ইন্দ্রিয়গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনে।

মিডিয়াম হওয়ার বিপদ

মিডিয়ামরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ন্তা প্রেতাত্মাদের অধীনে হয়ে পড়েন। যত সময় এগোতে থাকে মিডিয়াম হিসেবে কাজ করতে করতে সংশ্লিষ্ট মিডিয়ামটির আত্মসংযম শক্তি হারিয়ে যেতে থাকে। ইন্দ্রিয়শৈথিল্যও দেখা যায় এবং এর ফলে কখনও কখনও তাঁদের স্নায়ুতন্ত্র শিথিল ও সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়।
পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে মিডিয়ামদের মধ্যে শতকরা ৭৪ জন পশুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে পড়েন, শতকার ৬০ জন মূর্ছারোগগ্রস্ত হন, ৮৫ জনের স্নায়ুদৌর্বল্য ঘটে। আবার ১০০ জনের ভিতরে ৫৮ জন জালিয়াত ও প্রতারক হন, ৯৫ জনের নৈতিক সাহস বিনষ্ট হয়ে যায়। আর শতকরা ৪৪ জন হয়ে ওঠেন দাম্ভিক ও আত্মকেন্দ্রিক। এইসব কারণে ভারতীয় সত্যদ্রষ্টা মনীষীরা প্রেততত্ত্বানুশীলনে মিডিয়ামের কাজকে সমর্থন করেন না। বরং তাঁরা রাজযোগ প্রণালির কথা বলেছেন, যে প্রণালিতে অর্জন করা যায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিসম্পন্ন অলৌকিক শক্তি। এই শক্তি অর্জনের পথে কখনওই প্রেতাত্মাদের কাছে নিজেদের দেহ, মন ও ইচ্ছা কোনও কিছুকেই বলি দিতে হয় না। মিডিয়াম কিন্তু আত্মিক বিকাশের সমস্ত সুযোগ সুবিধা নষ্ট করে অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে থাকেন। এমনকী মৃত্যুর পরেও তাঁদের নিয়ন্ত্রক প্রেতাত্মার সঙ্গী হয়ে চিন্তা ও কর্মের ফলভোগী হতে হয়। প্রকৃত যোগী এই পার্থিব শরীরেই পূর্ণতা অর্জন করেন। প্রেতলোক, স্বর্গলোক ও অন্যান্য সমস্ত লোক অতিক্রম করে তিনি শাশ্বত জ্ঞানের পথে সিদ্ধ হন, আর তখন সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন শুরুতেই উল্লিখিত গীতার সেই শ্লোকের মর্মার্থ, যে শ্লোকটি হল- 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি...'।

তথ্য সহায়তা :

১) মরণের পারে-স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।

কয়েকটি শব্দের অর্থ বা পরিচিতি:

১) সিয়াঁস - প্রেতাদির গবেষকদের বৈঠক।

২) যোগেন- স্বামী যোগানন্দ। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী শিষ্য। স্বামী অভেদানন্দের গুরুভাই।

৩) বলরাম বসু- ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখযোগ্য এক গৃহী ভক্ত।


অমৃত বস্ত্রালয়
বাংলার তাঁতের অভিনব সম্ভার
লাল গোলাপি সঙ্গে জরি,
কন্যা যাবে শ্বশুরবাড়ি।


অমৃত সিল্ক সদন
ব্রাইডাল বেনারসি ও লেহেঙ্গার কালেকশান
FREE
বেনারসী সহ ৫০০০/- টাকার কেনাকাটার উপর
*শর্তাবলি প্রযোজ্য
নীল আশমানি সোনালি কাজে,
চোখ ভরে যায় তোমার সাজে।
৫৪০ জি.টি. রোড (সাউথ), হাওড়া-১। ফোন: (০৩৩) ২৬৬৭ ৩৪৬০, ৯৮৩১০২৮২৫০



সাধ্যের মধ্যে সাধপূরণ মানেই দেবশ্রী'জ

সামান্য গ্যারেজ থেকে নিজের ব্যুটিক শুরু করে আজকে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তবু এখনও মাটিতেই পা তাঁর। দেবশ্রী দাস মানেই তাই সাধ্যের মধ্যে সাধপূরণ। মধ্যবিত্তের ফ্যাশন স্টেটমেন্টকে বদলে দিয়েও নিজে এতটুকু বদলাননি তিনি। মুখোমুখি আড্ডায় সাবলীলভাবে বলে গেলেন নিজের জীবনের সংগ্রামের গল্প। দেবশ্রীর সাথে পরিণীতার হয়ে আড্ডা দিলেন **প্রীতম সেনগুপ্ত** আর ক্যামেরায় তাদের সঙ্গ দিলেন **সুমন্ত মুখার্জী**

ফ্যাশন ডিজাইনিংকে পেশা হিসেবে ভাবলেন কেন ?

আমি যখন ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে পড়ি তখন চলে যাই সানফ্রান্সিসকোতে। বুটিক বা ডিজাইনার হাউজ, ডিজাইনার ওয়্যার বলে যে একটা কনসেপ্ট হয় সেটা ওখানেই প্রথম দেখলাম। ছোটোবেলা থেকেই আমার ফ্যাশনের দিকে অসম্ভব ঝোঁক আর ভালোবাসা ছিল। সাউথ পয়েন্টে যখন নার্সারি ক্লাসে পড়ি অর্থাৎ খুব বড়জোর চার-পাঁচ বছর বয়স, তখন থেকেই বন্ধুদের জামা-কাপড় ডিজাইন করতাম, ব্যাক বেঞ্চে বসে ডিজাইন আঁকতাম। তখন তো অত রেডিমেড পোশাক পাওয়া যেত না। তাই ওরা মেটেরিয়াল নিয়ে আসত আর আমি ছবি এঁকে বলে দিতাম কীরকম হবে ডিজাইন, ওই অত ছোটো বয়সেই ! আসলে খুব ছোটোবেলা থেকেই আমার প্যাশনটা ছিল।.

আপনি সানফ্রান্সিসকোতে কেন গেলেন এবং কত দিন আগের ঘটনা এটা ?

আজ থেকে সতেরো-আঠেরো বছর আগে গিয়েছিলাম স্রেফ পড়াশোনা করতে। ওখান থেকেই গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করি। আমার সাবজেক্ট ছিল এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই যে প্যাশনটা আমার মধ্যে ছিল সেটা ওখানকার ফ্যাশন দুনিয়ার সংস্পর্শে এসে আরও প্রশ্রয় পেয়ে গেল। ফলে মার্কিন দেশ থেকে ফেরার পর কলকাতায় এসে স্বাধীনভাবে শুরু করলাম আমার মনের মতো ফ্যাশনের কাজ। কেয়াতলা লেনে একটা গ্যারেজ ভাড়া করলাম। আগেকার দিনের বাড়ির গ্যারেজগুলো যেমন বড় হয় সেইরকম বড় একটা গ্যারেজ। দু'শো স্কোয়ার ফিটের

মতো জায়গা। এটা ২০০৪-০৫ সালের ঘটনা। আমেরিকান একটা ফ্রেজ আছে না - 'আই স্টার্টেড মাই কেরিয়ার ফ্রম আ গ্যারেজ', এক্ষেত্রে ঠিক সেটাই হয়েছিল।

ঠিক কত পুঁজি নিয়ে আপনি প্রাথমিকভাবে নামলেন এই কাজে ?

আসলে আমার খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তখন বেশ কিছু টাকা পয়সা দিয়েছিলেন আমার বাবা-মা, হাজব্যান্ডও কিছু দিয়েছিলেন। এইভাবে মোটমাট পাঁচ লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছিলাম। ওই পাঁচ লাখ টাকা দিয়েই আমি গ্যারেজটাকে ভাড়া করি, রং করি, কাচ দিয়ে ডিজাইনিং হাউজে কনভার্ট করি আর আমার স্টক তৈরি করি। সেই সময় মেনস্ ওয়্যার নিয়ে কাজ শুরু হয়নি, শাড়ি আর মেয়েদের অন্যান্য পোশাক নিয়েই কাজ শুরু হয়। লোকজন ক্রমশ আমার ডিজাইনের পোশাক পরতে শুরু করল। ফরচুনেটলি একটি টেলিভিশন চ্যানেল তখন আমায় কভার করে, এর জন্য কোনও কস্ট দিতে হয়নি, আমার কস্ট দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল না। এর ফলে আমার একটু পপুল্যারিটি হল। আমার মাথায় তখন এটাকে ব্যান্ড করার ভাবনা আসে এবং সেই সুযোগও এসে গেল। আমার এক ক্লায়েন্টের হাজব্যান্ড ফেডারেল ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। তিনি একদিন বললেন, উইমেন এন্টারপ্রেনিওররাও লোন পেতে পারে। আমার বয়স তখন বড়জোর সাতাশ-আঠাশ। লোন কী, ব্যাঙ্কিং কী এই বিষয়গুলো আমি খুব বেশি বুঝতামও না, জানতামও না। যাই হোক গেলাম ওনার কাছে এবং উনি খুব চটপট পাঁচ লাখ টাকা লোনের বন্দোবস্ত করে দিলেন। লোনটা পাওয়ার পরেই ডিজাইনিং হাউজকে আরও গুছিয়ে তুলি এবং বছর খানেকের মধ্যেই এস্ট্যাবলিশড হয়ে যাই। কেয়াতলা লেনের জায়গাটা ডিজাইনিং হাউস হিসেবে ছোট ছিল, কিন্তু লোক লাইন দিয়ে শাড়ি কিনত। এইভাবে এক দেড় বছরের মধ্যে আমি এই প্রপার্টিটা (পি-২৩৯/২ হিন্দুস্থান পার্ক) কিনে নিলাম। এই জায়গাটা রিনোভেট করে এই যা স্টক দেখছেন সব আস্তে আস্তে নিজে তৈরি করে আজ এই জায়গায় এসেছি। এই মুহূর্তে আমার আন্ডারে ৩২ টা লুম আছে। আমার শোরুমে (যদিও এটা টিপিক্যাল হাউজ হিসেবে পরিচিতির চেয়ে শোরুম হিসেবেই বেশি পরিচিতি পেয়েছে) প্রত্যেকটা আইটেম কিন্তু আমার নিজের হাতে তৈরি। এই ৩২ টা নিজস্ব লুমের মধ্যে তিন চারটে রয়েছে ভাগলপুরে। এছাড়া কর্নাটকে আছে, তামিলনাড়ুতেও আছে, শান্তিনিকেতনেও আছে। ফুলিয়াতে





তাঁতের উপর কাজ করা হয় - এইরকমভাবে বিভিন্ন জায়গাতে আমার নিজস্ব প্রোডাক্ট তৈরি হয়। রেডিমেড পোশাক আমি বেশি রাখতে চাই না, কারণ প্রতিটি মানুষই আলাদা আলাদা। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত একটা ক্যারেক্টার। সুন্দর দেখতে মেয়ে তারও একটা স্টাইল। আমার একটা স্টাইল। ওই যে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন ওনার একটা স্টাইল - ফলে সবার স্টাইল আলাদা আলাদা। আমার কাছে ক্লায়েন্ট যখন আসেন, তখন তাঁর রিকোয়্যারমেন্ট অনুযায়ী, ব্যাকগ্রাউন্ড অনুযায়ী ড্রেস ডিজাইন করি, বানাই। অন্যান্য ডিজাইনার হাউসের মতো বানিয়ে বানিয়ে রেখে দিই না। একটা আইটেম লঞ্চ হয়েছে মানে যে কোনও কাউকে সেটাতে ভালো লাগবে এমন কোনও মানে নেই। ধরুন ওই যে ট্রানসপ্যারেন্ট ঢাকাইটা আপনাকে দেখালাম টিস্যু এবং সিল্কের উপরে, চিন্তা করুন ওটা একজন ষাট বছর বয়সের মহিলা, যিনি রীতিমতো মোটা, তার যদি ভালো লাগে পরতে তাহলে সেটা আমাকে বোঝাতে হবে ওনাকে যে এটা আপনি পরতে পারবেন না। সার্টেন ফিগার না হলে এটা কেউ পরতে পারেন না।

আপনি কোন ক্লায়েন্ট গ্রুপকে টার্গেট করেন ?

উ: আমার হচ্ছে মাস। আপনাকে, ওনাকে যে কোনো সাধারণ মানুষকে ডিজাইনার দেব। আমি খুব কম সেলিব্রেটি রিকোয়্যার করি। আসলে এর জন্য সেলিব্রেটির দরকার হয় না। যেহেতু প্রেস ভালোবাসে তাই আমি ডাকি। আমার কাছে মনে হয় - ডিজাইনিং ফ্যাক্টর ইজ মোর চ্যালেঞ্জিং ফর ডিজাইন সামবডি লাইক ইউ পিপল। আপনাকে যদি একটা শার্ট পরিয়ে আমি ভালো লাগাতে পারি দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট দ্যান বুম্বাদাকে কোনও শার্ট পরিয়ে ভালো লাগানো। আপনি আমার কাছে ক্লায়েন্ট হিসেবে আসলে আমি আমার প্রোডাক্টকে এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, যাতে সেটা আপনার পকেট ফ্রেন্ডলি হয়, ওয়েদার ফ্রেন্ডলি হয় এবং আপনি আপনার ক্যারেক্টরের সঙ্গে রিলেট করতে পারেন। এটাই হচ্ছে আমার ডিজাইনিং মোটো। যেটা নিয়ে আমি প্রচণ্ডভাবে স্ট্রাগেল করে যাচ্ছি। এর জন্য আমি খুব একটা ফ্যাশন উইকে যাই না। কেননা ওখানে একবার গেলে স্ট্যাম্পড হয়ে যাব যে - দেবশ্রী'স মানে অনেক এক্সপেনসিভ জামা-কাপড়। আপনি একজন সাংবাদিক হিসেবে আমার কাছে এসেছেন। আজ যদি ঢলঢলে একটা পাঞ্জাবি পরে আমার কাছে আসতেন তাহলে আমিও আপনার দিকে তাকিয়ে ভাবতাম, বাবা, এ সাংবাদিক ! এরকমভাবে এসেছে ! তাই

যেটা বলতে চাইছি, ফ্যাশন মানে কোনও বিলাসিতা নয়, নিজের প্রোফাইলটা ঠিক করা। আজকে আমি যে শাড়িটা পরেছি সেটা না পরে যদি সুতির খুব ম্যাড়মেড়ে একটা শাড়ি পরতাম তাহলে কেউ আমার পোশাক নিয়ে আগ্রহ দেখাত না, কেননা আমাকে দেখেই লোকে জামা-কাপড়গুলো কেনে। আমার ক্লায়েন্ট গ্রুপে রয়েছে সাধারণ দেখতে কোনও ভদ্রমহিলা যিনি আই.টি.তে আছেন কিংবা যিনি ডাক্তার কিংবা একজন হাউজ ওয়াইফ যার গায়ের রং রীতিমতো চাপা, বেশ ফ্ল্যাবি হয়ে গিয়েছেন (চল্লিশের পর আমরা এমনিতেই একটু ফ্ল্যাবি হতে শুরু করি) এনারা কী পোশাক পরবেন, কোন পোশাক তাদের সঙ্গে ঠিক ঠিক রিলেট করবে সেটা ঠিকঠাক দেখাটাই আমার কাজ। আবার আমি এই যে শাড়িটা এখন পরে আছি তার বদলে কোনও ঝমকোঝামকা দশ হাজার টাকার শাড়ি পরবো না, কারণ আমি পরতে পারি না, আমার ভালো লাগে না, আমি খুব ট্র্যাডিশন ভালোবাসি। অনেক সময় পরি, কেননা মার্কেট ডিম্যান্ড করে। এই যে ইনি (এক ভদ্রমহিলা) এই মাত্র শাড়ি কিনলেন, উনি বললেন -আমার মেয়ে খুব জরি চুমকিওয়ালা শাড়ি পছন্দ করে। কিন্তু মেয়েটি বেশ মোটা এবং গায়ের রংও চাপা। তখন আমাকে এব্যাপারে ভাবতে হয়েছে। তারপর আমাকে বোঝাতে হয়েছে ওনাকে।

এই যে আপনি কাউন্সেলিং করেন, এটা লোকে নেয় ?

হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্ড মোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট। যে সব মানুষেরা কোনওদিন পিঙ্ক পরতো না, (গায়ের রং চাপা মানেই আমাদের বাঙালিদের ধারণা আছে একটা কালো পরতে হবে বা কটকটে মেরুন পরতে হবে আর তা না হলে তসর কালার পরতে হবে) তাদেরকে শেখানো হয়েছে পিঙ্ক পরুন, গোল্ডেন পরুন, অরেঞ্জ পরুন, ফিরোজ ব্লু, স্কাই ব্লু পরুন আপনাকে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে।

আপনি পদবিটা আড়ালে রাখতে চান কেন ?

আমি সারনেম হাইলাইট করি না, কারণ আমি দেবশ্রীর সঙ্গে মানে আমার ব্র্যান্ডের সঙ্গে আমার নামটাই রিলেট করতে চাই। সেইজন্য দেবশ্রী রাখতে চাই।

আপনার ইনস্পায়ারিং আইকন কে ?

(একটু ভেবে) একজন আছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার প্রফেশনের।কোনও মিল নেই। তিনি বায়োকন - এর মালকিন - কিরণ মজুমদার শাহ। তিনি তাঁর জীবনে যা করেছেন সেটা আমার কাছে অকল্পনীয়। ট্রিমেন্ডাস অ্যাচিভমেন্ট, ওই অ্যাচিভমেন্টটাই একটা অন্য লেভেলের।





আমি ওনাকে খুব রেসপেক্ট করি, নিজের আইডিয়াল হিসেবে মানি।

আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় আছে ?

না, না, আমি ওনাকে দেখিইনি কোনওদিন। ওঁর কথা বইতে পড়ে ওনাকে, ওনার কাজটাকে রিয়েলাইজ করেছি।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গ, এখন তো ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে এ্যাকাডেমিক পড়াশোনাও হচ্ছে। এই বিষয়ে ডিগ্রিও দেওয়া হচ্ছে। এটা কতখানি দরকার বলে মনে হয় আপনার ?

দরকার আছে। দেখুন এর দুটো ভাগ আছে। ভাববেন না যে আমি যেটা বলছি সেটা আমার সঙ্গে তুলনা করে। কিন্তু যেটা বলার সেটা হল উত্তমকুমার কোনও দিন অ্যাক্টিং স্কুলে যাননি, একইভাবে কিশোরকুমারও যাননি গানের স্কুলে, এঁরা দুজনেই ন্যাচারাল ট্যালেন্ট। আর্ট জিনিসটাই সত্যি বলতে কী বেসিক্যালি একটা ন্যাচারাল ট্যালেন্ট। এটা যদি নিজের ভিতরে না থাকে তাহলে স্কুলে গিয়ে যতই ঘষামাজা করা যাক না কেন কোনদিনও কোনও লাভ হবে না। ঘষামাজা করে একটা সার্টেন লেভেল অবধি আসা যায়। কিন্তু সঠিক ফল পেতে গেলে ইনসাইডে আলাদা কিছু একটা থাকা দরকার তো বটেই। তবে আলাদা করে প্রথাগত পড়াশোনার লাভ কী হয় সেটা নিজেকে দিয়েই বলি।

যেমন আমি যদি এন আই এফ টি বা ওই জাতীয় কোনও ইনস্টিটিউটের থ্রু দিয়ে আসতাম তাহলে হয়তো ফ্যাশন শো দিয়ে অনেক অনেক বেশি লাইম লাইটে চলে আসতে পারতাম। কেননা সাধারণ মানুষকে নিয়ে কাজ করার ফলে আমি ফ্যাশন ডিজাইনিংটা অনেক ডিজাইনারদের থেকেও ভালো বুঝি। এছাড়া প্রথাগত শিক্ষায় টেকনিক্যাল অনেক কিছু জানা যায়, যেগুলো আমি অনেক পরিশ্রম করে ঠোক্কর খেয়ে শিখেছি। এই শিক্ষাটা থাকলে হয়তো এতটা ঠোক্কর খেতে হত না কিংবা এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে দিয়ে এগোতে হত না। এটাই হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রথাগত শিক্ষার সত্যি কারের প্লাস পয়েন্ট। অন্যদিকে মাইনাস পয়েন্টও আছে। আমি সমালোচনা করছি না, কিন্তু আই অ্যাম নট ভেরি হ্যাপি। ধরুন আমাকে যদি বলা হয় মেনস ওয়্যার করতে আমি সেটা করতে পারব, আবার আমায় যদি বলা হয় বিয়ের পোশাক করতে সেটাও পারব, কেউ হয়তো এসে বললেন বাড়িতে পুজো আছে তার জন্য দরকার সুতির ধুতি ও পাঞ্জাবি সেটাও করতে পারব। কেউ কটনের শার্ট পরতে চাইলে সেটাও করতে পারব। আবার কেউ বিয়ের

শেরওয়ানি পরতে চাইলে সেটাও করতে পারব। এই যে ভ্যারাইটি, এইসব ফ্যাশন কলেজগুলো থেকে শিখে যারা আমার কাছে আসে তাদের মধ্যে এই ভ্যারাইটিটা দেখতে পাচ্ছি না। ওরা একটা বাঁধা গতে চলে।

মহিলা এন্টারপ্রেনিওর হিসেবে যারা নতুন এসেছেন তাদের প্রতি আপনার মেসেজ কী ?

মেসেজ টু দ্য নিউকামার এটাই যে - নাথিং ইজ ইজি ইন লাইফ। এটা আমার একার কথা নয়, সবারই কথা। যে কোনও জিনিসই করতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়। আমি যে আজকে দেবশ্রী হয়েছি সেটাও কঠোর পরিশ্রমকে পুঁজি করেই। আর ডিজাইনার হিসেবে বলতে পারি প্রতিটা মানুষই একেকটি আলাদা আলাদা ক্যারেক্টার। সেই ক্যারেক্টার অনুযায়ী ডিজাইন করতে হবে, কপি করে কোনও লাভ নেই। কপি করে কোনও কাজ করলে সেই কাজ বেশি দিন থাকে না, একটা সময় হারিয়ে যায়।

আপনি তো বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু সেলিব্রিটি মানুষজনের সঙ্গে কর্মসূত্রে মেলামেশার সুযোগ পান। বিশেষভাবে এমন কেউ আছেন কি যার সাহচর্য আপনার কাজের বা চিন্তাভাবনার ওয়েভ লেন্থের সঙ্গে মেলে, ইন্সপায়ারিং হয়ে ওঠে ?

সেটা কিন্তু অবশ্যই ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। কিন্তু ও অত বড় আর্টিস্ট বলে নয়। আসলে ঋতু একটা অদ্ভুত ক্যারেক্টার। সবাইকে সব পোশাক বা সাজ মানায় না, কিন্তু ঋতু একেবারে অন্য মেটেরিয়াল। ওকে যা পরাই সেটাই কোথাও একটা যেন ফিট হয়ে যায়। ও কনশাসলি অথবা আনকনশাসলি গোটা ব্যাপারটাকে একটা ফ্লো-তে নিয়ে যেতে পারে।

দেবশ্রী'স তো এখন অনেকটাই এক্সপ্যান্ড করেছে, সীমিত অবস্থায় নেই। এই এক্সপ্যান্ডটা কীরকম ?

এখন ইন্টারন্যাশনালি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের জামা-কাপড় যায়। সারা পৃথিবী জুড়ে আমার ৬৫ টা হোলসেল শোরুম আছে। লন্ডন, ফ্লোরিডা, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ আর আমাদের দেশে তো অনেক জায়গাতেই রয়েছে। এই মুহূর্তে রিয়াল এস্টেটের দাম প্রচুর,কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয় কিনতে। সেইরকমভাবে কেনার ক্ষমতা আমার নেই। তাই আমি কী করেছি, যে শাড়িটার কস্ট ধরুন সাড়ে তিন হাজার টাকা সেটা মুম্বইতে ক্রেতার হাতে সাড়ে তিন হাজারেই তুলে দিচ্ছি, এর জন্য আলাদা কোনও কস্ট লাগছে না। সেইজন্যই পৃথিবীর প্রায়



নানান কর্নারে পৌঁছে গিয়েছি। আর পয়লা বৈশাখে চালু হয়েছে আমাদের অনলাইনটা। অনলাইনে সব শাড়ি, জামা-কাপড় আপলোড হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে আমার পোশাকের ক্রেতাদের কাছে শপিংটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এই অনলাইন স্টোরে আমার সমস্ত কালেকশনগুলোই পাওয়া যাবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তা, ধুতি, পুরুষদের শার্ট, ওয়েস্টার্ন পোশাক, ব্যাগ, জুয়েলারি ও বিভিন্ন অ্যাকসেসারিস। সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষ যারা ইন্টারনেটের ব্যবহারে অভ্যস্ত তারা সকলেই এই অনলাইন শপিংয়ের সুবিধা পাবেন। আর আমার ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা হল যখনই আমি লগ ইন করব তখনই আমার জিনিসের সম্ভার সহজেই দেখে নিতে পারব। একজন ক্রেতা অন্তত ১০০টা পোশাকের ভিতর থেকে নিজের পছন্দসই ১টি পোশাককে বেছে নেন, তখন সময় আর জায়গাটা একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। সারা ভারতে আমার জিনিসের শপিং যাঁরা করবেন তাদের আলাদা কোনও চার্জ দিতে হবে না। আমরা ফ্রিতে ডেলিভারি দিয়ে দেব। দেশের বাইরের ক্রেতাদের অবশ্য একটা আলাদা ডেলিভারি চার্জ বহন করতে হবে।





মডেল : রূপসা, শ্রুতি, কেয়া, স্বাগতা
মেকআপ: শম্ভু ভৌমিক
পোশাক : দেবশ্রী'জ
ফোটো : সুমন্ত মুখার্জী



পয়লা বৈশাখে দেবশ্রী'র নতুন কালেকশন 'বিয়া'

পয়লা বৈশাখের আগের দিন উদ্বোধন হল দেবশ্রীর নতুন কালেকশন 'বিয়া'। অসমিয়া ভাষায় বিয়েকে বলা হয় 'বিয়া'। যেহেতু অসমের মেয়েদের অতি পরিচিত পোশাক মেখলা নিয়ে এবার কাজ করছেন দেবশ্রী, তাই এই কালেকশনের নাম মেখলা। তবে এই মেখলা ফর্ম্যাল, সেমি-ফর্ম্যাল কিংবা ক্যাজুয়াল পার্টির পরিধেয় হিসেবে গণ্ডি পেরিয়ে এবার হাজির হচ্ছে একেবারে বিয়ের আসরে। যার পোশাকি নাম বেনারসি মেখলা। বিয়ে ছাড়া, বিয়ের পার্টি, অ্যানিভার্সারি, জন্মদিন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানেও পরা যাবে এই বেনারসি মেখলা। এর দাম ১৫,০০০-৩৫,০০০ টাকার মধ্যে। বেনারসি আজও তার মূল্যের বিচারে সম্মানীয়, এর সঙ্গে মেখলাকে সংযুক্ত করেছেন দেবশ্রী। মেখলা মেয়েদের দৈনন্দিন পোশাক হিসেবে সহজে পরিধেয় ও আরামদায়ক। এই দুয়ের সংযোগে দেবশ্রী এক অনন্য সৃষ্টিভাবনার পরিচয় রাখলেন আবার। দেবশ্রী মনে করেন ফ্যাশনের প্রেক্ষিতে অসমের পোশাক অনেকটাই অবহেলিত। তিনি এই বেনারসি মেখলা তৈরি করে মেখলাকে ফ্যাশন দুনিয়ায় এক অনবদ্য অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিলেন। বেনারসি মেখলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ঋতুপর্ণার সঙ্গে একান্তে কথাবার্তার সুযোগে কিছু প্রশ্ন রাখলাম।

বাংলায় ফ্যাশন নিয়ে এখন অনেকরকম কাজকর্ম চলছে, সেই প্রেক্ষিতে দেবশ্রীর জায়গাটা কীরকম ?

দেবশ্রী অনেকদিন ধরেই কাজ করছে, এই বুটিকটাও অনেকদিনের। ওঁর শাড়ির কালেকশনগুলো আমার খুব ভালো লাগে। শাড়ির মধ্যে সবসময় ইনোভেশন প্লে করার চেষ্টা করে, মোটিফগুলো কী সুন্দর। কালার কম্বিনেশনও সুন্দর। ওর যেটা সবচেয়ে ভালো লাগে সেটা হল অনেকরকম ফেব্রিকের সঙ্গে অনেকরকম মিক্সিং। উদাহরণ হিসেবে যেমন সিল্ক -কটন। আর বাই কালারের কাজে ফিউশনের ব্যাপারটা থাকেই। এই যেমন বেনারসি - মেখলা, এটা তো খুব আনইউজুয়াল ব্যাপার। এর আগে ও ধুতি করেছিল। আর ও খুব গর্জাস জিনিসটাকে আনতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা সাবস্টিটিউট হয়ে যায়, কিন্তু ও সবসময় গর্জাস ব্যাপারটাকে নিয়ে আসতে পারে। এছাড়া কালার ডিসপ্লে, বর্ডার এগুলোও বিশেষ করে বলার মতো। কালারটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার টু হার।

দেবশ্রী দাবি করেন তিনি মাস বা সাধারণ মানুষের জন্য পোশাক বানান। সেলিব্রিটি হিসেবে আপনার এই বিষয়ে কী মত ?

আমরাও তো মাসের জন্য। আমার মনে হয় মাস কানেকশনটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ফ্যাশন ডিজাইনার বা অভিনেত্রী যাই হোক না কেন, মাস কানেকশনটা যত বেশি থাকবে পপুলারিটিটা তত বেশি হয়। আর আমার মনে হয় সেটাই হওয়া উচিত। আর মাসের জন্য যদি প্রাইস লেভেলটাও ঠিক থাকে তাহলে সবাই এটা এফর্ট করতে পারবে।

দেবশ্রীর ইউনিকনেসটা কী ?

শি হ্যাজ গট ভেরি ইনোভেটিভ আইডিয়াজ। শি ক্যান অলসো ইন্ট্রোডিউস রাইট থিংজ ইন রাইট টাইম।



গরমে সামার কুল



রেড টপ তার সাথে ফ্লোরাল ডিজাইনের হট প্যান্ট।

পিঙ্ক স্লিভলেস টপের সাথে ফ্লোরাল প্রিন্ট -এর জিনস্

অ্যাবসট্র্যাক্ট প্যাটার্ন এর সাথে ব্ল্যাক কম্বিনেশানের সর্ট ড্রেস।

পোশাক: রাখি
মডেল: অর্পিতা
মেকআপ: শম্ভু ভৌমিক (9088316671)
ক্যামেরা: সুমন্ত মুখার্জী (9830858485)
কাস্টিং: সুরঞ্জিৎ (9674207234)


Ekakanya SAREES
exclusive print embroidery sarees and ethnic wear
কোরা, ক্রেপ, চান্দেরী, গিচা, পসমিনা,
জর্জেট, নেট, শিফন, ল্যাহেঙ্গা, ডিজাইনার
বিয়ের শাড়ি ও সালোয়ার পিস, সেমি স্টিচ,
কুর্তি ও স্যুটের অফুরন্ত সম্ভার।


১৯১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, রামমন্দির
(Opp: Petrol pump) কলকাতা-৭
Ph: 033 65006200/2272 9640
Mail: ekakanyaa@gmail.com
Website: www. ekakanya.com

পার্শ্ব রচনা

চিরনবীন সত্যজিৎ



*'তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবো খেলা এই আমি'...*

সত্যিই, কে বলে সত্যজিৎ রায় নেই? তিনি আছেন বাঙালির মননে,চিন্তনে, অন্তরের অন্তঃস্থলে। শুধু বাঙালি কেন শিল্পমনস্ক ভারতবাসী মানেই শেষ নিঃশ্বাসটুকু ফেলার আগের দিন পর্যন্ত মনে রাখবেন সাহিত্যিক, পরিচালক,চিত্রকর তথা শিল্পের শিক্ষক সত্যজিৎ রায়কে। নিজেকে শিল্পের একজন কারিগর মনে করতেন তিনি। প্রবীণরা তো বটেই, এ প্রজন্মের শিল্প অনুরাগী তরুণ তুর্কিরাও তাঁকে সম্বল করে বড় হবার প্রেরণা পায়।
সচেতন পাঠক আশা করি ভুলে যাননি,তাঁকে নিয়ে আজ আবারও কেঁচে গণ্ডুষ করার কারণ কী? ১মে শ্রমিক দিবসের ঠিক পরের দিন তাঁর জন্মদিন। আর তাঁর জন্মদিন পালনের প্রধান রসদ তাঁর শিল্পকীর্তিকে পুনরায় উদ্ঘাটন। সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকীর্তি আজ পাঠের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ভাবনা আজও প্রতিমুহূর্তে পদে পদে প্রমাণ করে তিনি কত বড় দক্ষ শিল্প কারিগর ছিলেন। ধারালো লেখনী, মজবুত ভাবনা দিয়ে তিনি যে বিশাল ইমারত গড়ে তুলেছেন তা ভেঙে ফেলার সাধ্যি কার? শিল্পের কারিগর হিসেবে



তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ সাহিত্যের হাত ধরে। চলচ্চিত্রজীবনের বহু আগে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু।
১৯৪১ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁর লেখা ইংরেজি গল্প 'Abstraction' প্রকাশিত হয়। তবে, তাঁর সাহিত্যচর্চা অধিক জনপ্রিয় পায় বাংলাভাষাতেই। বিনোদনবিহীন বাঙালির বাঙালিত্বই বৃথা। আর সেই বিনোদনের অন্যতম দাতা সত্যজিৎ রায় স্বয়ং। তিনটি ভিন্নধর্মী সিরিজের জন্য তিনি তিনটি চরিত্র এঁকেছিলেন। গোয়েন্দা সিরিজের জন্য 'ফেলুদা অ্যান্ড কোং', বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের জন্য 'প্রোফেসর শঙ্কু' এবং রসে টইটম্বুর গল্পের জন্য 'তাড়িণী খুড়ো' আজও বাঙালির হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। তাঁর প্রথম বাংলা মৌলিক গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি' প্রকাশিত হয় সন্দেশ পত্রিকায় ১৯৬১ সালের অক্টোবর সংখ্যায়। ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সন্দেশ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' । পরে এই গল্পটি অবলম্বনে তিনি ইংরেজিতে 'দি এলিয়েন' নামে একখানি চিত্রনাট্য লেখেন। তবে তা কোনওদিন ছবি হয়ে ওঠেনি। ১৯৬৭ সালে নিউস্ক্রিপ্ট থেকে প্রকাশিত 'প্রোফেসর শঙ্কু' বইটির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যের অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান। দ্বিতীয় ছোটগল্পটি হল 'সেপ্টোপাসের খিদে' । এটিও ১৯৬২ তে সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত। ফেলুদার গল্পও প্রথম প্রকাশিত হয় 'সন্দেশ'-এর পাতায়। তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' (১৯৬৫-৬৬-র ডিসেম্বর, ফেব্রুয়ারি)। ভিন্ন স্বাদের ছোটগল্প দিয়ে তিনি সিরিজ শুরু করেছিলেন 'এক ডজন গপপো', 'আরো এক ডজন', 'আরো বারো', এবারো বারো', একের পিঠে দুই' ।
শুধু লেখালিখি নয় অনুবাদেও ছিল তাঁর অসীম দক্ষতা। এডওয়ার্ড লিয়ন এবং লুইস ক্যারলের বহু লিমেরিক এবং কবিতা তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এইভাবেই বাবা সুকুমার রায়ের বিভিন্ন ছড়া ও 'আবোল তাবোল' ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন তিনি। বহুমুখী প্রতিভা সমৃদ্ধ করেছিল তাঁকে।
নিজের শৈশব নিয়েও তাঁর অনবদ্য বই 'যখন ছোট ছিলাম' (১৯৮২) । চলচ্চিত্র নিয়ে লেখা তাঁর 'আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস'এবং বিষয় চলচ্চিত্র' । 'একেই বলে শ্যুটিং মূল্যবান আকর হিসেবে বিবেচিত চলচ্চিত্র জগতে।
১৯৮১ তে 'ফ্যান্টাস্টিক' পত্রিকার সপ্তম বার্ষিকী সংখ্যায় চার অধ্যায়ে রচিত 'সবুজ মানুষ' শিরোনামের একটি কাহিনি প্রকাশিত হয়। যার একটি অধ্যায় লিখেছিলেন সত্যজিৎ রায় (শেষ অধ্যায়)। আকাশবাণী ভবন সূত্রে জানা যায় কাহিনিটি লেখকদের নিজমুখে সম্প্রচারিত হয়েছিল আকাশবাণী কলকাতার 'সাহিত্য বাসর'

অনুষ্ঠানে।

প্রসঙ্গত সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্যকর্ম মূলত কিশোরদের জন্য হলেও তা আবালবৃদ্ধবনিতার কাছেও সমান উপভোগ্য। আবার প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা 'ময়ূরকণ্ঠী জেলি' ১৯৬৫ সালে 'আশ্চর্য পত্রিকার' শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হবার পর বেশ সাড়া পড়েছিল।

সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়ের শিল্পচর্চার হাতেখড়ি আচার্য নন্দলাল বসুর কাছে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অর্নাস নিয়ে বি.এ পাশ করার পরই নন্দলাল বসুর শরণাপন্ন হন সত্যজিৎ। নন্দলাল বসুর প্রিয় শিষ্য ছিলেন তিনি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' ১৯৫৬ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল রূপে চিহ্নিত হয়। 'অপরাজিত' ছবির জন্য ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবে 'গোল্ডেন লায়ন' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯১ সালে দ্বিতীয় এশিয়ান ফিল্ম ডিরেক্টর হিসেবে অস্কার লাভ। চার্লি চাপলিনের পর চলচিত্র জগতের মানুষ হিসেবে তাঁকেই ডক্টরেট উপাধি দেয় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। এরপর দাদাসাহেব ফালকে, ভারতরত্ন সবই তাঁর ঝুলি পূর্ণ করে একে একে। কাহিনি চিত্র, তথ্যচিত্র, শর্ট ফিল্ম সব মিলিয়ে মোট আটত্রিশটি ছবি পরিচালনা করেছেন তিনি। বাবা সুকুমার রায়কে নিয়েও বানিয়ে ছিলেন তথ্যচিত্র। পরিকল্পনা ছিল পণ্ডিত রবিশঙ্করের ওপর একটি মিউজিক্যাল ডকুমেন্টারি করার। রবিশঙ্করের সেতারের সুরবিহার শোনা গিয়েছিল পথের পাঁচালী, অপুর সংসার, পরশ পাথর, অপরাজিত ছবিতে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরি করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গিয়েছিল। তাঁর পাঁচটি তথ্যচিত্র রবীন্দ্রনাথ, দ্য ইনার আই, বালা, সিকিম, সুকুমার রায়। এ সবের পাশাপাশি নিজেই তৈরি করেছিলেন BIZAN, HOLIDAY,RAYMOND-নামের তিন সেট ইংরেজি বর্ণমালা এক মার্কিনি সংস্থার জন্য। ১৯৬১ তে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্র নির্মাণের পর ১৯৬২ তে কেন্দ্রীয় সরকারের এক অন্যায় আবদার ফিরিয়ে দেন তিনি। তথ্যচিত্রের আঙ্গিকে তাঁকে তৈরি করতে বলা হয়েছিল চিন বিরোধী এক প্রচারচিত্র। সরাসরি এই প্রস্তাব নাকচ করেন সেদিন। এর জন্য অবশ্য তাঁর কেরিয়ার এবং



সম্মানলাভে কোনও ভাঁটা পড়েনি।

চলচ্চিত্রে তাঁর অপার অবদানের জন্য একাদশ মস্কো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সম্মানিত হন তিনি। সম্মানিত হন বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও। ৩২তম ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড এও পুরস্কৃত হন। 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ মোশান পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স' তাঁকে সম্মানিত করে। দুঃখের কথা, সেদিনের সেই বর্ণময় অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারেননি এই বিশ্ববরেণ্য পরিচালক। তাঁর বক্তব্য হাসপাতালের শয্যা থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল সেদিনের অনুষ্ঠানে। সুপরিচালক হিসেবে 'আকিরা কুরোসাওয়া অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন সানফ্রান্সিসকো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। ১৯৯২ সালে জীবনের একেবারে শেষলগ্নে এসে তাঁর হাতে আসে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড। এহেন শিল্পী কারিগরের পুরস্কারের ঝুলি খুলে বসলে তা গোছানো কষ্টকর। কিন্তু তাঁর ৯৩ তম জন্মদিনে তাঁকে লিখিত পথে শ্রদ্ধা জানাতে হলে এছাড়া যে আর কোনও উপায় নেই। কারণ তাঁর প্রতিটি প্রশ্বাসে ছিল শিল্পের ঘ্রাণ।

সত্যজিৎ পরিচালিত মহানগর,চারুলতা, অপুর সংসার, নায়ক, অপরাজিত, সোনার কেল্লা থেকে শুরু করে শেষ ছবি আগন্তুক আজও নতুন। চিরকাল নতুনই থাকবে। পরবর্তী প্রজন্মও দেখবে ছবিগুলি। মানবজীবনকে প্রভাবিত করে প্রত্যেকটি ছবি। জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে যে সব ছবি তিনি পরিচালনা করেছিলেন তার বেশিরভাগ শ্যুটিং ঘরের ভিতর করতেন।

সত্যজিৎ রায়ের মতো ব্যক্তিত্বের প্রশংসার পঞ্চমুখ হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর সঙ্গে কাজ করার পর তাঁর প্রশংসা করেছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর, বিলায়েত খান, আলি আকবর খানের মতো কিংবদন্তিরা। তাঁকে নিয়ে কথা শেষ হবে না কখনই। বাকি থেকে গেল অনেক কথাই। তবুও সীমিত জানার পরিধিটাকেই তুলে ধরলাম কাগজে কলমে। সত্যজিৎ রায়ের মতো শিল্পের পূজারীকে একবার নয় লক্ষ কোটিবার সম্মান ও শ্রদ্ধা জানায় পরিণীতা পরিবার।



বিগবস কঙ্গস্

ছোট থেকেই স্বপ্নের মানুষটির নাম মিঠুন চক্রবর্তী। আর সেই মিঠুনদাই একেবারে কাঁধে হাত রেখে বলেছেন তোকে ঠিক আমার ছেলের মতো দেখতে। বিগবসের ঘর থেকে বেরিয়ে কঙ্গশ এখন বাংলার নতুন স্টার। নতুন ছবি পিকনিক, মুক্তি পেয়েছে সদ্য। এবার টলিউডের সেই নতুন হি ম্যান-এরই মুখোমুখি পরিণীতা।

মিঠুন চক্রবর্তী নাকি তোমার এক নতুন নামকরণ করেছেন?

উঃ (হাসি) হ্যাঁ। বিগবসের ঘরে থাকার সময়েই মিঠুনদা আমর নাম দেন হি-ম্যান অব টলিউড।

তোমাকে কিন্তু অনেকটা...

উঃ হ্যাঁ, মিঠুন দা নিজেও আমাকে বলেছিলেন, তোকে ঠিক মিমোর মতো দেখতে।

বিগ বসের এক্সপিরিয়েন্স একটু বল।

উঃ আমি একদিন বাইক নিয়ে কোথাও একটা যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার মোবাইলে ফোনটা এসেছিল.. হ্যালো আপনি কি কঙ্গশ কলিম? আমি বিগবস (বাংলা) থেকে.. বলছি। প্রথমে মনে হয়েছিল কোনও বন্ধুবান্ধব মজা করছে, কেটে দিয়েছিলাম ফোনটা। তারপর ওরা আবার ফোন করে। আসলে সত্যি ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি, বিগবসের মতো এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে ডাক পাব। এমনকি শ্যুটিং করতে যাওয়ার জন্য যেদিন ফ্লাইটে উঠছি সেদিন ও মনে হয়েছিল, সত্যি না স্বপ্ন দেখছি।

কিন্তু বিগবসে তোমার জার্নি তো খুব ছোট হয়েছিল?

উঃ হ্যাঁ, আমি প্রথম এলিমিনেশানেই বাদ পড়ে যাই। কিন্তু বিগবসের ঘরে যে কয়েকটা দিন কাটিয়েছি সেটা একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স। কত মানুষ ভোট দিয়েছিলেন আমার জন্য। এখন রাস্তাঘাটে মানুষ যে চিনতে পারেন সে তো অনেকটা বিগবসের জন্যই।

আর প্রথমবার মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্তটা?

উঃ ম্যাজিক্যাল। আসলে দেখ বাংলায় সমস্ত সাকসেসফুল অভিনেতা, আপকামিং স্টার বা স্ট্রাগলার ছেলেদের বোধহয় একজনই আইডল আর তার নাম মিঠুন চক্রবর্তী। শুধু জেদ আর লড়াই দিয়ে একজন মানুষ নিজেকে কোথায় নিয়ে যেতে পারেন, মিঠুনদা তার সবচেয়ে বড় বড় উদাহরণ। আমিও ছোট থেকেই মিঠুন চক্রবর্তীর মতো হতে চেয়েছি। বিগবসের শ্যুটিং ফ্লোরে যখন ওর সঙ্গে দেখা হল আমি জাস্ট পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আর তার সঙ্গে প্রচণ্ড নার্ভাস। ইউ নো, তোমার সেই স্বপ্নে দেখা মানুষটা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে, তোমার আইডল, তোমার ইন্সপিরেশান... জাস্ট বলে বোঝাতে পারব না সে অনুভূতিটা। তারপর আবার তিনি আমার ইন্টারভিউ নেবেন। মিঠুনদাই এসে ব্যাপারটা সহজ করে দিয়েছিলেন। অত বড় একজন স্টার অথচ কী অসাধারণ ব্যবহার। আমার পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন তোকে ঠিক আমার ছেলে মিমোর মতো দেখতে। এখনও মুহূর্তটা মনে পড়লে সারা গায়ে কাঁটা দেয়।

তুমি অভিনয়ে এলে কীভাবে?

উঃ দেখ আর পাঁচজন অভিনেতার মতো এখানে আমার উত্তরটাও সেম। ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিল অভিনয় করব, স্টার হব। লাইট ক্যামেরা... খুব স্বপ্ন দেখতাম। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে মুম্বই চলে



গিয়েছিলাম অভিনয় শিখব বলে। ওখানে ভর্তি হলাম ক্রিয়েটিভ ক্যারেক্টারস- নামের একটা অ্যাকটিং স্কুলে। ঋত্বিক রোশন, সোহা আলি খান, সোনাক্ষী সিন্‌হা, অনুষ্কা শর্মা, সবাই এই স্কুলের পাশ আউট। ওখান থেকে বেরিয়েই প্রথম সুযোগ এল 'চহেরা' নামের স্টার প্লাসের একটা হিন্দি মেগা সিরিয়ালের লিড রোলে। ভাবলাম, ব্যস এবার তো লাইফ সেট। কিন্তু আনফরচুনেটলি সিরিয়ালটা কিছু প্রবলেমের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময়টা মুম্বইতে প্রচুর স্ট্রাগল করতে হয়েছে। টাকার জন্য ক্রাউড হয়ে দাঁড়িয়েছি কত শ্যুটিংয়ে, পার্টটাইম জিম ইন্সট্রাক্টারের কাজ করেছি। তারপর আবার বাংলায় চলে এলাম। এখানে কিছু সুযোগ তৈরি হল।

তুমি তো প্রচুর মডেলিং ও করেছ?
উঃ হুঁ। মডেলিং আমার প্যাশন বলতে পারো। আমি ২০০৫-এ গ্রাসিম মিঃ ইন্ডিয়ার টপ ফাইভে এসেছিলাম। এখনও প্রচুর র‍্যাম্প শো করি।

তোমার ফিজিকটা কিন্তু একেবারে বলিউডি।
উঃ থ্যাঙ্কস। আসলে আমি খুব ফিটনেস ফ্রিক। রেগুলার জিম না করলে আমার ঘুম হবে না।





তোমার বাংলা ছবিতে জার্নিটা কীভাবে শুরু হল?
উঃ বাংলা ছবিতে আমায় প্রথম সুযোগ দেন পরিচালক রাজ মুখার্জী। রাজদার লাভ লাভ লাভ দিয়ে আমার কেরিয়ার শুরু বাংলায়। তবে দর্শক আমায় প্রথম চিনতে শুরু করে ডার্লিং দিয়ে। রাজদার-ই ডিরেকশানে আমি ডার্লিং-এ অ্যান্টি হিরোর চরিত্র করি - ঋষি। ওটাই আমার সেই অর্থে প্রথম ব্রেক বলতে পারো।

সিনেমার পাশাপাশি সিরিয়ালেও তো তোমায় দেখা গেছে।
উঃ হ্যাঁ। আমার কাছে কাজটা কাজ। বড় পর্দা বা ছোট পর্দা আমার কোনওটাতেই কোনও আপত্তি নেই। স্টার জলসার সয়ম্বরেও আমি কাজ করেছি, আবার বাংলা সি আই ডি তেও। ইনফ্যাক্ট সি আই ডি -তে আমি প্রথমবার একেবারে রোম্যান্টিক হিরোর চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম।

এবার তোমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে একটা প্রশ্ন, তুমি নাকি খুব স্পিরিচুয়াল?
উঃ আমি ছোট থেকেই এরকম। তবে ইদানীং বাবা তাজ উল ওয়ালিয়ার আশীর্বাদ পাওয়ার পর থেকেই সত্যি জীবনের মানেটাই বদলে গেছে।

আর তোমার লাভ লাইফ, টল ডার্ক হ্যান্ডসাম গার্লফ্রেন্ডের লিস্ট নিশ্চয়ই খুব লম্বা?
উঃ না না একেবারেই নয়। আমি বেসিক্যালি খুব লাজুক। তবে হ্যাঁ সোশ্যাল নেট ওয়ার্কিং সাইটে নানা বয়সের মেয়েরাই দেখি খুব বন্ধু হতে চায়। কিন্তু আমার এখন একটাই ফোকাস আর সেটা হল আমার কেরিয়ার।

জীবনে এমন কোনও স্বপ্নের রোল আছে যেটা করতে চাও?
উঃ না তেমন কিছু নেই। আমি এখনও যেটুকু করতে পেরেছি আমি তাতে খুশি। তবে স্বপ্নের চরিত্র বললে... হ্যাঁ সাগর ছবিতে কমল হাসানের চরিত্রটা আমার মনে ভীষণ দাগ কেটেছিল।

স্বপ্নের পরিচালক?
উঃ আমি সবার সঙ্গেই কাজ করতে চাই। সিনিয়ার-নতুন, সবার সঙ্গেই। পরিচালক রাজ মুখার্জীর সঙ্গে তো সব সময় কাজ করতে চাই। এছাড়াও আর এক রাজদা মানে রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গেও কাজ করার খুব স্বপ্ন আছে। পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলির আমি অন্ধ ভক্ত। নতুন প্রজন্মের মৈনাকদার কাজগুলোও আমার খুব ভালো লাগে।

তোমার রিসেন্ট ছবি পিকনিক -এর অভিজ্ঞতা।
উঃ খুব ভালো করে কাজ করেছি আমরা। রাজদা কাজের ডিটেইলস এত বোঝেন যে ওনার সঙ্গে কাজ করতে গেলে আলাদা করে কিছু ভাবতে হয় না। রাজদা সবই করিয়ে নেন। তবে শ্যুটিংয়ে আমরা প্রচুর মজা করেছি। অর্জুন চক্রবর্তীর মতো সিনিয়র অ্যাক্টার ছিলেন আমাদের সঙ্গে। অনেক কিছু শিখলাম ওনার কাছে। এখন পিকনিক-টিমের সব কাস্ট অ্যান্ড ক্রু আমরা সবাই মিলে একটাই প্রে করছি, পিকনিক ভালো চলুক, মানুষ আসুন পিকনিক দেখতে। ফিঙ্গার ক্রস।

মনটা কোনও সময়েই চৌকাঠবন্দি হয়ে থাকতে চায় না। সকল সময়েই সে যেন ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েই আছে। অথচ এই আটপৌরে ঘরখানি ও আমার বড়ো প্রিয়, তবুও কে যেন পাঁজরের গোপন অন্ধকারে দূর দিগন্তের বাতাসের চামর বুলিয়ে দেয়। তখন আর থাকতে নারি প্রিয় গৃহকোণে! মন তখন যেন চিকন আকাশে উড়ন্ত ঘুড়ি। রইল পড়ে পলেস্তরা খসা চৌখুপি গৃহকোণের আরামপ্রদ আলিঙ্গন। তখন আমি উধাও, উধাও আকাশের পিঠ ছুঁয়ে ভাসমান সাদা মেঘের ভেলার মতো। এইরকম অনুভূতি আমার প্রায়ই হয়। শুধু অনুভূতিই হয় না, তা আমাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। ঘরের কোণে একনাগাড়ে থিতু হতে দেয় না। বন্ধুজনেরা বলেন, তোর পায়ের তলায় সরষে আছে। হয়তো তাই।
কিছুদিন হল, একটা ধারাবাহিক লেখা সদ্য শেষ করেছি। শরীর জুড়ে যেন একরাশ ক্লান্তির ফল্গুস্রোত। সহজেই অনুমেয়, খানিক বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু ওই যে নাছোড় মন, সে তো আমাকে আলিশান হয়ে গৃহযাপন করতে দেবে না। তার মতিগতি, আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ানো। অতএব চলো। পথের ধুলোয় পা ডুবিয়ে মনটাকে নিরস্ত করি গে।
ক'দিন যাবৎই একটা চেনা ছবি দৃষ্টিপথের আগল খুলে বারবার দৃশ্যমান হচ্ছে। শুধু তাই নয়। হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বলছে, এসো। অনেকদিন তো এদিক পানে আসোনি। একবারটি অন্তত এসো।...না এই ডাক উপেক্ষা করার সাধ্য আমার নেই। হৃৎপিণ্ডের অলিন্দ জুড়ে যেন দূরমনস্ক পাখির অফুরান আহবান। স্বগত সংলাপে অদৃশ্যমান কাউকে যেন জানিয়ে দিই, আমি আসছি। একটু প্রতীক্ষা কর। অন্তত একটা দিন।
...চোখের ইজেল ছুঁয়ে সেই পরিচিত প্রেক্ষিত। সেই চেনা জায়গা। প্রায় একইরকম তার ভঙ্গী। যদিও পরিবর্তনের বেমানান আঁচড় তার সর্বাঙ্গে প্রায় দগদগে ঘায়ের মতন দৃশ্যমান। অন্তত আমার চোখে। ধান-মাঠ এখানে কথা বলতো। অনন্ত নীলিমার অন্ধকারে এখনও কি বলে? কে জানে! হয়তো সে এখন মূক কিংবা বধির কিংবা সাবলীলও হতে পারে।...আমার মধ্য যৌবনের বেশ কিছু প্রহর এখানে অতিবাহিত হয়েছে। আজ আমি প্রবীণ। বয়সের বেলা বেশ বেড়ে গিয়েছে। তবুও এখানে পা রাখার পর শরীরের ছিলায় যেন যৌবনের টান অনুভব করি। মনের গোপন প্রাঙ্গণে যেন একরাশ কৃষ্ণচূড়া তার নিজস্ব লালিমায় উঁকি দিয়ে যায়। পায়ে পায়ে কখন যে প্রণবেন্দুদের বাড়ির চৌকাঠে পা রেখেছি, ঠিক টের পাইনি। এই প্রণবেন্দুর সঙ্গেই আমার বন্ধুত্বটা এমন একটা পর্যায়ের স্তরে, যা বোধ করি কোনওদিন বিলীন হবে না। একমাত্র এরই সঙ্গে আমার যোগাযোগ অম্লান। সেই কবে চলে এসেছি, তবু আজও এই বন্ধুর সূত্রেই এই জায়গার সঙ্গে আমার বন্ধন নিটুট। কলিংবেলের সুইচে আঙুলের আলতো চাপ দিই। দরজা হাট করে খুলে যায়।
-প্রদীপদা, ভাবতেই পারিনি তুমি আবার আসবে। তোমার ফোন পেয়ে



মিথুন প্রতিমা

প্রদীপ পাল

অলঙ্করণ: প্রত্যুষ ঘোষ

অবধি...
প্রণবেন্দু তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমাকে অমলিন সখ্যতায় জড়িয়ে ধরে। সত্যি এমন বন্ধু কোটিতে গোটাকতক মেলে কী না সন্দেহ।
-তা হঠাৎ কী মনে করে তোমার এই আগমন? কতবার যে তোমাকে আসার জন্য বলেছি...
-না, সেরকম কিছু নয়। তবে মনটা ক'দিনই খুব উদ্বেল হয়ে উঠেছিল এই জায়গাটার জন্যে।
-যাক, তবু ভালো।
কথায় কথায় বিকেল গড়িয়ে সন্ধের আঁধার নেমে আসে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর দুইবন্ধু পায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়ি।... পরিবর্তনের হাজারো আঁচড়েও আমার এই প্রেক্ষিতভূমি যেন কোনও এক ক্ষেত্রপটে একইরকম আছে। সেখানে কোনও তথাকথিত আধুনিকতার আঁচড় পড়েনি। সেই খড়ি নদী এখনও বিপিনপুর শ্মশানের গা ছুঁয়ে প্রবহমান। দিগন্তবিসারি মাঠে ধানের সবুজ ঢেউ। অধুনা ঝাঁ চকচকে বিউটি পার্লারের পাশে কেষ্টদার সেই অবিকল খোড়োচালের আন্তরিক চায়ের দোকান। অবিশ্যি কেষ্টদা আজ বৃদ্ধ। মুখের চামড়ায় এখন তার অজস্র আঁকিবুকি। অথচ ঠোঁটের কোনায় আজও সেই স্নিগ্ধ হাসি।... সত্যি কেষ্টদা, তোমাদের আমি ভুলে যায়নি। দিনের কত প্রহর যে তোমার দোকানের ঠেকনা দেওয়া বেঞ্চিতে বসে যাপন করেছি। তার হিসেব নেই। আমাদের কত দৌরাত্ম্য যে তুমি হাসিমুখে সহ্য করেছ, তার তো প্রমাণ আমি নিজেই। তোমাকে তাই কুর্নিশ। কুর্নিশ গোপন হৃদয়ের।
জি.টি. রোড ধরে এলোমেলো পায়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াছি। সাঁজের আকাশে অজস্র তারার ভিড়। অনেক অনেকদিন পর নিজেকে বেশ নির্ভার লাগছে। স্মৃতির তটে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনার সিম্ফনি তার সুরেলা মূর্ছনায় বারবার বেজে উঠছে। ...ওই তো সেই বুক কর্নার, সাংস্কৃতিক আড্ডার আর একটি ঠেক। হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে একটা প্রশ্ন পাঁজরের সিঁড়ি ভেঙে ঠোঁটের ডগায় এসে আলটপকা ঝরে পড়ে।
-এখনও কি ওখানে জমাটি আড্ডা হয়?
-না।
-সে কি? তার ধারাবাহিকতা...
আর ধারাবাহিকতা! রতন যতদিন ছিল...
রতন এখন কোথায়?
জামসেদপুরে। একটা চাকরি জুটিয়ে প্রায় বছর তিনেক আগে চলে গিয়েছে। তাছাড়া দোকানের মালিকানাও...
-তাও বদল হয়ে গিয়েছে?
-হ্যাঁ।
মনটা বড়ো বিষণ্ন হয়ে গেল। রতনের মুখটা যেন চোখের সামনে দুলছে। বুক কর্নারের কর্মচারী, এই ছিল তার পরিচয়। কিন্তু আদতে সে ছিল সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন এক যুবক। তারই দৌলতে আমাদের জমায়েত বা আড্ডা ওখানে ফুল স্যুইংয়ে চলত। আজ আর সেখানে কোনও ফুল ফোটে না। প্রবাহিত হয় না কোনও উন্মনা বাতাস। তবে চলতিপথে নানান নতুন পরিকাঠামোর পাশাপাশি চোখে পড়ে সেই দোতলা বিডিও অফিস, সেটেলমেন্ট অফিসের একফালি বারান্দা, আর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উল্টোদিকে সদ্য সাদা রঙের প্রলেপ দেওয়া জয়া সিনেমা হল। যাক তবুও তো কিছু অবশিষ্ট আছে। নতুন যুগ, নতুন সময় সবকিছুকে গ্রাস করতে পারেনি। সারা শরীরে কে যেন শান্তিজল ছিটিয়ে দেয়।
ফেরার পথে প্রণবেন্দুকে অস্ফুটে বলি, প্রণব, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?
-বলো।
-আমি একবার কাজলের কাছে যেতে চাই। নিয়ে যাবে?
-কাজলের কাছে? প্রণবেন্দুর চোখে মুখে বিস্ময়ের বিদ্যুৎ ঝলক।
- ওর কারণেই আমার এখানেই আসা।
-ঠিক আছে, তবে কাল গেলে হয় না? এখন তো ওদের পিক আওয়ারস।
-না, না। আজই। তবে তোমার যদি অসুবিধে থাকে...
-নো অসুবিধে। আমিই যাব।
যথাসময়ে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে আমরা দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ি! কিন্তু তথাকথিত সংসারের চৌকাঠ ডিঙিয়ে কি অসময়ে বার হওয়া অত সহজ! তাই পাশের গ্রাম পারাজের যাত্রানুষ্ঠানের কথা বলে চৌকাঠ ডিঙোতে হয়।
...সেই খাপরার চালে ছাওয়া সারিবদ্ধ ঘর। মাঝে চৌকোনা উঠোনের কেন্দ্রবিন্দুতে সেই পুরোনো ইদাঁরা। নোতুন সংযোজন একটা শুধু ডিপ টিউবওয়েল। বেশ কিছু ঘরের দরজা বন্ধ। তবে কয়েকটি ঘরের দুয়ারে উগ্রসাজে কয়েকজন মেয়ে দাঁড়িয়ে। আমি চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিই। প্রায় সবই একরকম। এমন কী সেই ঝাড়ালো বটগাছটা সরকারি পাটখেতের উত্তর পূর্ব কোণে একই রাজকীয় মহিমায় দাঁড়িয়ে।... আকাশে অবিশ্যি আজ নবমীর টালমাটাল চাঁদ তার হিম জ্যোৎস্না নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত। কারণ আজ তো নবমী তিথি নয়। কিন্তু সংসারের প্রান্তসীমায় নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বারাঙ্গনাদের এই পল্লিতে আজ হাজির হয়ে সেই কবেকার নবমী নিশির কথা আমার হৃদয় দোল খেয়েই চলেছে। সেই মেঠো সানাই, নাল,ক্ষয়াটে চেহারার হারমোনিয়াম আর ঢোল সহযোগে 'সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি'র মাতাল সুরে কাজলের শরীরী নাচ, শিউলির প্রাণোচ্ছল রসিকতা আজ যেন কতদূরে। অথচ মনে হয়, এই তো সেদিন। মনে পড়ে, তরল পানীয় সেবনের পর আমিও কেমন অপটু ছন্দে কাজলের সঙ্গে নৃত্যে সামিল হয়েছিলাম। ইতিমধ্যে কখন যে কাজল এসে আমার পাশে এক সমুদ্র-উচ্ছ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল করিনি। ঘোর ভাঙলো তার কণ্ঠস্বরে।
কী লিখিপড়িবাবু, এতোদিনে আমাকে মনে পড়লো?
- না কাজল এতোদিনে মনে পড়েনি। তুমি আমার মনের মধ্যেই আছো।
-তা এতোদিন দেখা মেলেনি কেন?
-সময় হয়নি তাই।
-মিছে কথা বাবু। এ তোমার এক্কেবারে মিছে কথা।
কী করে বোঝাই আমার মিথুন প্রতিমাকে। আমার যে নিজস্ব সময় বলে কিছু নেই। যেটুকু অবসর পাই, ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কিংবা পরবর্তী লেখার প্রস্তুতি নিতে হয়। ছা-পোষা লেখকদের থুড়ি কলমচিদের এমনই অবস্থা। তারা না হোমে না যজ্ঞে। অথচ পাতা ভরানোর বেলায় তারাই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।
-তা ঘরে চলো।
পা বাড়াই কাজলের ঘরের দিকে। অবশ্য কাজলের সেই ঘর এখন অন্যের দখলে। ওর ঘর এখন উঠোনের একেবারে শেষপ্রান্তে। ব্যবসাপত্তর থেকে নিজেকে অনেকদিনই সরিয়ে নিয়েছে সে। এখন শুধু এখানে দায়িত্ববোধের ফ্রেমবন্দি হয়ে দিন গুজরান করা। অথচ এইসব পল্লির মাসি বলতে যে ছবি সচরাচর আমাদের চোখে সামনে ভেসে ওঠে তার কণামাত্র ওর মধ্যে নেই। কবেকার সেই দেখা সহজ এবং সরলতার এখনও সে যেন প্রতিভূ। প্রণবেন্দু তার স্বভাবমতো কোন ফাঁকে কখন যে নিজেকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়েছে, টের পায়নি।
এত অল্প সময়ের মধ্যে আপ্যায়নের এতটুকু ত্রুটি রাখেনি কাজল। আমি অবাক মানি ওদের আতিথেয়তার বহরে। অগত্যা রামপাখির কয়েকটুকরো মাংস আর তিনপেগ রাম সেবনে ওরা ধন্য হয়। ঘর ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসে। মুখোমুখি শুধু আমি আর কাজল। নদীর বহতা স্রোতের মতো সহজ ছন্দেই প্রশ্ন আলটপকা ভেসে আসে, কেমন আছো কাজল?
—আর আছি! প্রাণপাখি কবে যে পিঁজরা থেকে বার হবে?
-কেন, তোমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না?
-না বাবু, অনেক কাল তো হল। আর বাঁচার ইচ্ছে নেই।
আমি কাজলের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাই। সেই চোখ, সেই ঠোঁট, দেহের সেই অপার চপল ভঙ্গিমা। অথচ কোথায় যেন একটা ভাঙন। ভাঙনের ঠুনকো রেখা। আমি কাজলকে আশ্লেষে আলিঙ্গন করি। ওর অধরোষ্ঠে ডুবিয়ে দিই আমার ঠোঁট। স্বগত সংলাপে উচ্চারণ করি, কাজল তুমি আমার মিথুন প্রতিমা। যৌনতার সাবলীল পাঠ তুমি আমাকে প্রথম দিয়েছ। তোমায় ভুলি কেমনে।
দুরগামী একটি ট্রেনের শব্দে আমার ঘোর কেটে যায়। চোখ মেলে দেখি,কাজলের চোখে জল। জলের নীরব রেখা। বিদায়বেলায় কথা দিই, আমি আবার আসব কাজল। আবার। তুমি অন্তত... আর কথা সরে না। জিভটা যেন হঠাৎ বোবা হয়ে যায়। একগলা বাষ্প গলার অন্ধকারে কখন যে আটকে গিয়েছে, খেয়াল করিনি।

এসো কবিতা

যৌনঘর ও মন্দিরকথা

ব্রজেন্দ্রনাথ ধর

বাঙালির যৌনঘর যেন এক অপরাধ গৃহ
সেই গৃহে ঢুকতেই অপবিত্র অচ্ছুত
তাই সে অযৌন ছাতা ধরে রাখে
সব মহৎ মাথায় আর পুষ্প চড়ায়
যত দামি পুষ্প দিয়ে ঘিরে রাখা যায়
তত তিনি হিমালয় দেবতাত্মা-মহান
অথচ দেবতা দেখো দেবীদের নিয়ে
আকণ্ঠ যৌন-পিপাসা ভরা স্রোত হয়ে আছে
এই স্রোত ছাড়া এই পৃথিবীর মানুষ কি
শুদ্ধ হতে পারে
বীর্য আগুন যদি আলিঙ্গন না করে শরীর
শুদ্ধ হবে কোন আগুনে পুড়ে
যৌনঘর মন্দির করে আমি মুগ্ধ হয়ে আছি...
দিন দিন সব প্রিয় ফুল নিয়ে দেখো
সব প্রিয়জন কত প্রশান্তির ঘরে...

গল্প

জয়নাল আবেদিন

এক একদিন ভ্রমণ হয়, বাতাস ছড়িয়ে দেয় সুর
নাচ শুরু হয় রোদের ভেতর, ম্লান মুখে সামনে
দাঁড়ায় ছায়া, গায়ে কাপড় নেই।
আমার চারপাশের কথাগুলো গল্প হয়ে যায়
লিখতে পারি না, ছটফট করি
আর দাঁতাল মেয়েটা সানকি হাতে ডাক দেয়
জল মুড়ি এনেছি খেয়ে নাও।



অলঙ্করণ : বিতান তামলী

দোটানা

মণীশ ভৌমিক

কত কথামতো কত নীরবতা
লুকোয় মনের আড়ালে,
কে কবে কোথায় সুরে সাড়া দেয়
ঠিক কথা ক'টি বাড়ালে,
বলা খুব দুষ্কর।

অপার্থিবের হাতছানি ফের
তোলে ঢেউ ইশারায়,
আলো ও আঁধারে   ইচ্ছেটা তার
ইঙ্গিতে দোল খায়।

অসীমের ডাকে সাড়া দিতে গেলে,
আমার যা কিছু দিতে হবে ফেলে।
কি জানি কিসের ব্যথা মর্মের,
কাঁপে দেহ, স্মৃতিস্বর
দরজা পেরোলে জীর্ণ আঁচলে
চোখ মোছে চরাচর।



ধাতব মানুষ

আমজাদ আলি হালসানা

নীরস খোলসের ভেতর হাঁটছে মানুষ
সাপের খোলসে এখন প্রেমের সুড়ঙ্গ।
প্রকৃতির নিয়ম ভেঙে গড়ে ওঠে
ভালোবাসার অদ্ভুত ঘরবাড়ি।
ঋতুর তোয়াক্কা করে না বয়স।
প্রতি মুহূর্তে পৃথিবী নামক সংসারে
ছড়িয়ে পড়েছে বিপরীত প্রেম,
ছোবল মারছে ধাতব যৌবন।
বিক্রি হচ্ছে প্রেমের খালি খাপ, স্থাপিত হচ্ছে পাপ।
বয়সের কোনও ধার ধারে না কামুক পুরুষ।
এবং খুব সাবধানে, খুব অবলীলায়
চলন্ত বাস ট্রেন এগিয়ে চলে
সেইসব পাপের চিহ্ন বয়ে নিয়ে।

জীবন

সুহিনা বিশ্বাস

বয়সটা কুড়ি থেকে বাইশের খাতে
তখনই জোরাজুরি মাতামাতি চারহাতে
এক করার প্রবল বাসনা- ঢের হল ব্রহ্মচর্য
এবার খোকন খাও দাও, সুখ নাও।
জোয়ালটা
কাঁধে নিয়ে চালাও লাঙল...
এই তো জীবন, এই তো আখ্যান
যুগ থেকে যুগে-সমাজতন্ত্রের
এক অত্যাশ্চর্য গূঢ় উপাখ্যান।

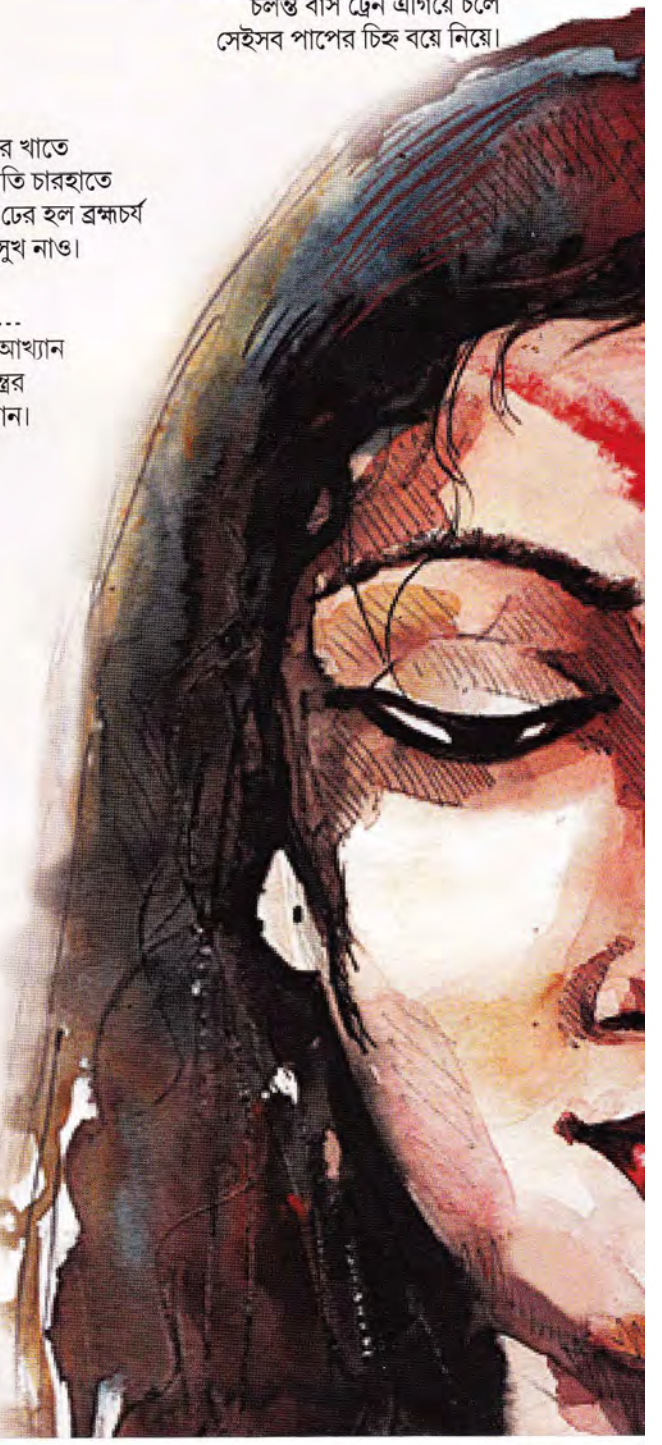
সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মাঝখানে

মানস ঘোষ

আমার সূর্যোদয় হয় শিশুরা সাইকেলে চেপে যখন ইস্কুলে
যায়।
আমার সূর্যোদয় হয় সাইকেলে
ওড়না ওড়াতে ওড়াতে একদল যুবতীর ছোটাছুটিতে।
আমার সূর্যোদয় হয় খাবার ছুঁড়ে দেওয়া পাখিদের ডানায়।
আমার সূর্যোদয় হয় 'দখল' শব্দটি যখন
ওলটপালট খায় খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়।
আমার সূর্যোদয় হয় দিদির বান্ধবীর বিবর্ণ
মুখখানি দেখে।

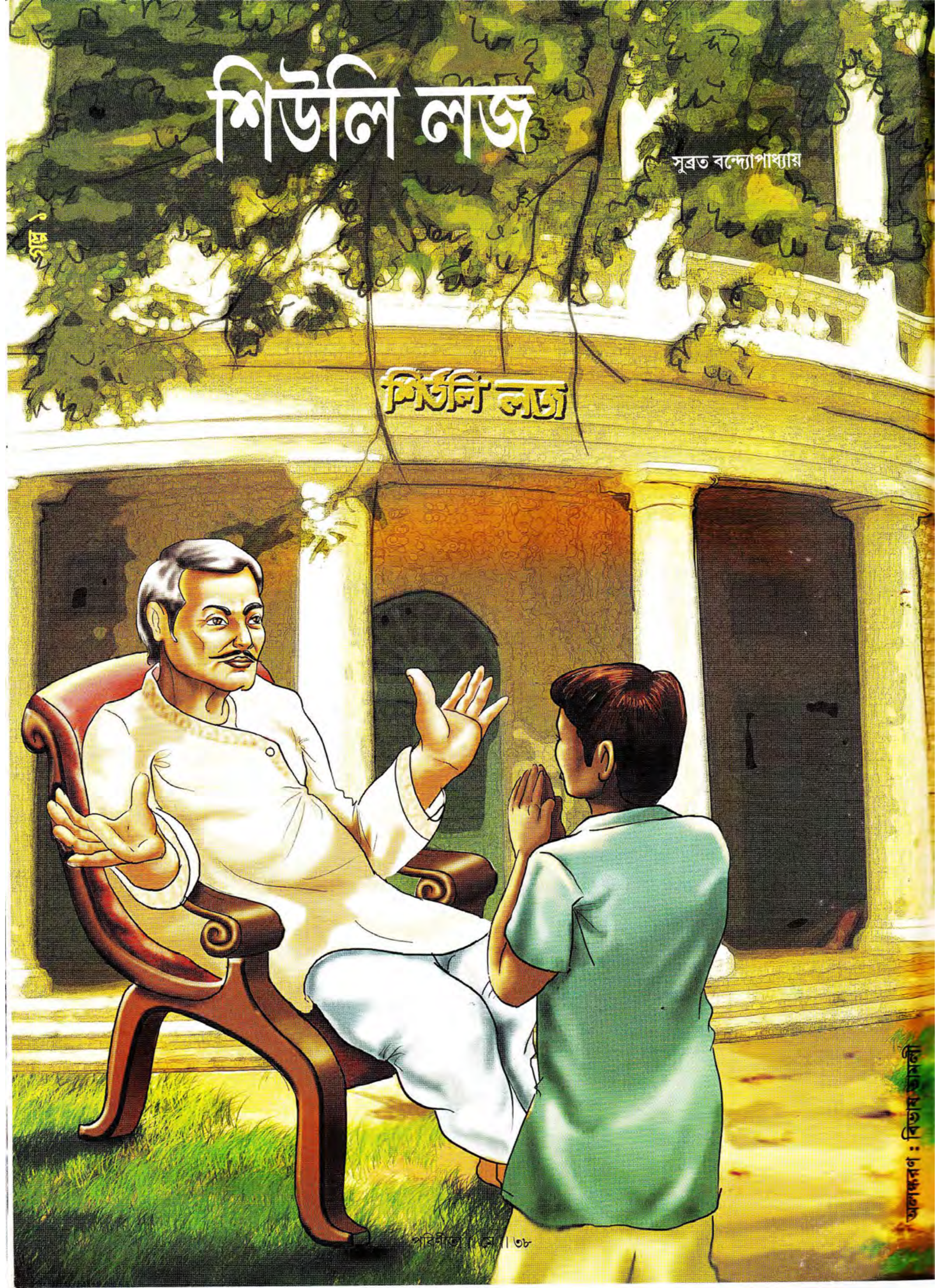
শুধু সাইকেলের আওয়াজের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে
আছে পৃথিবীর জানালায়
'রক্তকরবীর' নন্দিনীর মতো অন্ধকার ভাঙতে
চেয়েছিল সে। পারেনি!

আমার সূর্যোদয় হয় সিঁদুর মোছা মেয়েটার
চার বছরের সন্তানের ফ্যাকাশে মুখটায়।
আমার সূর্যোদয় হয় পাখিদের ডানায় রক্তের
ছিটে! দখলকারীদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে!
সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে,
কী ভীষন যন্ত্রণায় সারারাত ঘুমোতে পারিনি!



শিউলি লজ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়



কী ভায়া, মুখে চিন্তার ভাব দেখি কেন? চিন্তা তো হবেই। কথায় বলে অন্নচিন্তা বড় আতান্তরে ফেলে দেয় তাবড় সব মানুষকে। আমি তো কোন ছার।
তা অন্নচিন্তা হল কেন? টাকার যোগান নেই বুঝি? কাজকর্ম কি করা হয়?
কাজ নেই বলেই তো মহা মুশকিল।
তা গেল কিসে কাজ?
আর যা আক্রর দিনকাল পড়ল। কাজ করতাম কালাচাঁদ মুদির দোকানে। তা এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে মাল বেচে কালাচাঁদের আর পড়তা পোষায় না। তাই সে দোকান লাটে তুলল। ফলে আমি পড়ে গেলাম গভীর গাড্ডায়।
তা গাড্ডাটা গভীর বটে। তা ভেবে চিন্তে উপায় তো বার করতেই হবে। ঘরে পুষ্যি ক'জন?
সে ঝুট ঝামেলা নেই কর্তা। থাকর মধ্যে ছিল বুড়ি মা। গেল চোতে তিনি চোখ বুঝেছেন।
ওহ তা হলে মেলা গোলমাল নেই বললেই চলে। তা মুদির বাইরে আর কিছু কাজ জানা আছে?
সে যদি কন শরীরটা আমার তাগড় বটে। মেলা ফাইফরমাস খাটতে পারি। চাষের কাজ জানা আছে, লাঙল দেওয়া, ধান রোওয়া, ঢেঁকি চালানো, দুধ দোওয়া এসব কিছু কাজে অভিজ্ঞতা আছে অল্পবিস্তর।
বেশ বেশ তবে তো উপায় হবে। বলি ও হল তো বাইরের কাজ। ঘরের ভেতরে কাজ জানা আছে কিছু? ভেতরের কাজ? বিশদে বলেন তো বুঝি।
এই ধরো গিয়ে গেরস্থালি গোছানো, রান্নাবান্না করা, বাড়ির দেখাশোনা..... এসব আর কি।
তাও জানা আছে বটে। মা বলত গোকুল তোর হাতে রান্না বড় ভালো খোলে। তোর ইস্ত্রির কপাল খোলা।
তো ইস্ত্রিও আছে নাকি? তবে যে বলছিলে বেবাক একা।
না না সে তো মায়ের শখের কথা কইছিলাম। তেনার বড় শখ ছিল ছেলের বৌয়ের সেবা নেওয়া। সেই অপূর্ণ শখ নিয়েই মা সগ্যে গেছে।
তাই বলো। তবে রান্না যখন জানো মনে হয় বিপদ কেটে গেছে।
বলছেন কর্তা ?
বলছি। কারণ হল গিয়ে আমি এক রাঁধুনির সন্ধান করছি।
তোমার তো বেশ ঝাড়া হাত পা, সুবিধেই হল দেখছি।
কাজটা কোথায় যদি বলেন।
সেটা হল গিয়ে চক্রপুরে।
সে আবার কোথায়?
ওই যে হরিদেবপুর থেকে হেঁটে মিনিট পনেরো। বড় বাড়ি, কিন্তু লোকজন নেই। জনা দুই মানুষ কেবল ওই বাড়িতে বাস করে।
সে যে বড় ভালো কথা।
হ্যাঁ ঝুট ঝক্কি নেই বললেই চলে। তাই তো নবগোলাপ অদ্দিন টিকে ছিল।
তা এখন সে ছাড়তে চাইছে তাই আপনি লোকের সন্ধান করছেন?
ঠিক তাই। বয়স হয়েছে তো। এবার গোপাল বাড়িতে বসে জিরান নেবে। আমাকে দিন কয়েক আগে খুব করে বলেছিল, নিবারণ একটা তাগড় লোক দেখে দাও। তা আমাদের কাজকর্ম তেনাদের পছন্দ হলে আমি রাজি।
আরে তেনাদের পছন্দ তো হবেই। তুমি রাজি কিনা বল আগে।
খুব রাজি। রাজি না হয়ে উপায় কি? পেটে তো কিল মেরে থাকতে পারি না।
ঠিক আছে, তবে ঠিক এইখানটায় কাল সকালে এসো। তোমায় নিয়ে যাব ওই বাড়িতে।

॥ ২ ॥

বাড়িটার দেখনদারি আছে। বড় বড় গোলাকার থামের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সাদা বাড়িটাকে দেখলে রাজপ্রাসাদ বলে মনে হয়। কিন্তু এ তল্লাটে রাজাই বা কোথায়। তবে হরিদেবপুর বা তার আগে মাধবপুরে এমন জাঁকালো বাড়ি নেই, তা সত্যি। থাকলে গোকুলের চোখে পড়ত। এই চক্রপুরে আগে কখনও আসেনি, তাই এমন কুবেরের কাঠামোটা দেখতে পায়নি। এই পেল্লায় রাজবাড়িতে কাজ করতে হবে নাকি? গোকুল ভেতরে ভেতরে চুপসে এতটুকু। নাহ্ চেনা নেই, জানা নেই গাছতলায় আলাপ। লোকের কথায় বেবাক ঝাঁপিয়ে পড়া বুদ্ধির কাজ হয়নি মোটে। অবশ্য এসে যখন পড়েছে এখান থেকে ফিরে যাওয়া যায় না। দেখাই যাক না। দেখাই যাক কী হয়।
কী হে ছোকরা, তুমি যে জবুথবু মেরে গেলে। এখনি যদি বেদম হয়ে পড়ো তবে খাটবে কী করে? আর কর্তামশাই এমন ভ্যাদভেদে চেহারা দেখে কাজে নিযুক্ত করবেন কী করে?
কতটা সঠিক বটে। নিবারণের বাক্যবাণে গোকুল গা ঝাড়া দেয়। মনে মনে যত উৎসাহের বুলি আওড়াতে থাকে যাতে বাইরে চেহারাটা বেশ ডগমগ থাকে। নাহ্ কাজটা যেমন করে হোক বাগাতে হবে। সামনে আবার সমুদ্রের মতো রাশি রাশি দিনগুলো পড়ে। সে সমুদ্রে দাঁড় বাইবে কি করে যদি রসদ না থাকে। পিঠের দিকটা গোত্তা মেরে শিড়দাঁড়া টান টান করে নেয় গোকুল। এর ফলে বুকটা যেন চিটিয়ে ওঠে। জোয়ান পুরুষের জোশ থাকে অঙ্গে।
কথাটা মনে থাকে যেন, নিবারণ ফের সাবধান করে, কাজকর্ম তেমন কিছু নয়। ওই বুড়োর রান্না আর বাড়িটার দেখভাল করা যাতে পোড়োবাড়ি বলে কেউ বদনাম রটাতে না পারে। এই মুলুকে তো বদনাম করার লোক বেশি, সুখ্যাতি করার লোক হাতে গোনা।
লোহার গেট পেরিয়ে মূল বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে পাশের বাগানে এক ছোট পাকাঘরের কাছে গিয়ে হাঁক পাড়ে নিবারণ, নবদা আছো নাকি হে?
দু'বার ডাকার পরই এক সিড়িঙ্গে বৃদ্ধ এসে দাঁড়ায়। ধুতিটা মালকোঁচা বেঁধে পরা, গায়ের পরা ফতুয়া ঘামে জবজবে। হাত পা বেশ লম্বা লম্বা, দীর্ঘকৃতি মুখবয়বে কুতকুতে চোখ দুটোয় ক্লান্তিভাব স্পষ্ট। দেখলে মনে হয় দীর্ঘদিনের পরিশ্রম যেন এই বৃদ্ধের থেকে লাবণ্য কেড়ে নিয়ে কাঠিন্য আর মলিনতা দিয়েছে।
ওহে নিবারণ যে। যাক তুমি কথা রেখেছ। বৃদ্ধের আশ্বস্তভাবে খুশি চলকে ওঠে।
কী এমন কথা যা ওই মলিন মুখে হাসির ঝলক এনে দিতে পারে? কিছু বুঝতে না পেরে গোকুল একটু থতমত খায়। তাকে অপাঙ্গে দেখে নিয়ে বৃদ্ধ বলে, বাহ্ বেশ গায়ে গতরে সাজোয়ান চেহারা। দেখলেই মনে হয় বেশ তাগদ আছে। পরিশ্রমে পেছপা হবে না। তা তোমার নাম কি বাছা?
আজ্ঞে গোকুল, গোকুল রানা। আস্তে আস্তে মিয়ানো গলা মিনমিন করে।
বেশ বেশ। দেখেশুনে তো কর্তামশাইয়ের পছন্দ হবে বলেই মনে হয়। তোমার বাড়িতে কে আছে?
কেউ নেই গো নবদা। তাই তো বড় আতান্তরে পড়ে গেছে বেচারা। থাকার মধ্যে ছিল বুড়ি মা, মাস ছয়েক আগে ওপরে গেছে।
তা বাছা বাপ মা চিরকাল তো থাকে না। আর এখানে সঠিক জায়গায় এসে পড়েছ। কর্তামশায়ের পছন্দ হলে জীবন কেটে যাবে। গোকুল ভাবছিল জিজ্ঞাসা করে তবে আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? দেখে মনে হয় এখনও পরমায়ু আছে। তবে কোথাও কিছু না পেয়ে সে বিকট ধন্দে আছে। ও সব উল্টোসিধে প্রশ্ন এই দুর্যোগের সময়ে করা ঠিক হবে না। কাজ কেঁচে যেতে পারে। সে চুপ করে থাকে।
তাকে চুপ করে যেতে দেখে নবগোপালের ধন্দ লাগে। কি হল ছোকরার মুখে কুলুপ আঁটা কেন? এমন তাগড়া চেহারার লোক এনেছে নিবারণ, প্রথমেই বাগড়া পড়ে গেল নাকি? এস্ত নবগোপাল তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে, কি বাড়িঘরদোর পছন্দ হয়েছে? বাসের জায়গা মনমতো না হলে মন বসা মুশকিল।
কি বলবে গোকুল? তার তো এখন দু'কান ছুঁয়ে হাসতে ইচ্ছা করছে। এই জমিদার বাড়ি তার পছন্দ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করছে! তার বর্তমান হাল তো জানা নেই, সে এখন ভাঙাচোরা কুটিরে থাকতে রাজি। কেবল খেতে পেলেই হল। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তবে গুহ্য

কথা প্রথমে তো বলা যায় না। তাই সে মুখে মৃদু সম্মতি জানায়, খুব পছন্দ।
বাবা, চেহারা তাগড় হলে কী হয়, গলার আওয়াজ যে চেষ্টা করে শুনতে হয়, নবগোপাল গাল ভরিয়ে হাসে। তা বেশ, কর্তামশাই আবার হাঁকডাক পছন্দ করেন না। তেনার কথা হল গতি থাকবে কাজে, মুখে নয়। তা বাছা এখন একটু জলটল খেয়ে জিরেন নাও। তারপর কর্তামশাইয়ের কাছে যাওয়া যাবে। জিরেন নিলে দেহের ক্লান্তি দূর হবে, মুখ বেশ টাটকা লাগবে, তেনার পছন্দ হবে।

।। ৩ ।।

নবগোপাল একটা কুশন দাও দিকি।
কর্তামশাইয়ের গলার স্বর মিহি নয়, আবার যাকে জলদগম্ভীর বলে তেমনও নয়। কণ্ঠস্বরে একটা সুরেলা কর্তৃত্ব মিশে আছে। শুনলে মনে হয় এই স্বরের অধিকারী মোলায়েম হুকুমে অভ্যস্ত।
নব বড় সোফা থেকে একটা কুশন কর্তামশাইয়ের কাছে দেয়। তিনি সেটা মাথার পিছনে পালঙ্কের গায়ে রেখে হেলান দিয়ে বলেন, আহ!
নবগোপালের সঙ্গে গোকুল যে ঘরে এসেছে তা বেশ বড়। তিরিশ বাই পঁচিশ হবে। এই পেল্লাই বাড়ির সঙ্গে মানানসই করে বোধয় সব ঘরের মাপই বড়। কড়িবরগার সিলিং উঁচু। ঘরের মেঝে ইটালিয়ান মারবেলে তৈরি। সাদাকালো পাথরে তৈরি সেই মেঝে দাবার বোর্ডকে মনে পড়ায়। আজকাল এত উঁচু সিলিং দেখা যায় না। ঘরে ঢুকেই প্রথমে যা চোখে পড়ে তা হল হাতে আঁকা ছবির প্রাচুর্য। দেওয়ালের পাশে থাকথাক করে সাজানো আছে বহু ছবি। প্রত্যেকটা সোনালি বাহারি ফ্রেমে মোড়া। এছাড়া দেওয়ালে বহু ছবি আছে। এক ঝলক দেখে নিয়ে গোকুল ভাবে টাঙানো ছবিগুলো যেন আরও জীবন্ত। যেগুলো খুব ভালো হয়েছে সেগুলো দেওয়ালে টাঙানো আছে বোধহয়। অবশ্য গোকুল ছবির কীই বা বোঝে। তবে ছবিগুলো ভারতীয় সনাতন পদ্ধতিতে আঁকা। সাদা চোখে দেখলেও ভালো লাগে।



কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু জানা হয়েছে? কর্তামশাইয়ের প্রশ্নে তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ে গোকুল, আজ্ঞে হয়েছে।
বাহারি কাজ করা পালঙ্কের উপর আধশোয়া বৃদ্ধের বয়স আন্দাজ করা শক্ত। আশির ওপর তো বটেই নব্বইও হতে পারে। তবে চামড়া লোলচর্ম নয়। সাদা ধুতি পরনে, ফিনফিনে হওয়ার দরুণ আন্ডারপ্যান্ট ফুটে উঠেছে। গায়ে ঘিয়ে রঙের বেনিয়ান, ওপর দিকে তিনটে বোতাম থাকলেও লাগানো হয়নি। পালঙ্কের ওপরে ভারী পাখাটা বহু পুরোনো হলেও হাওয়া দিচ্ছে বেশ।
তা ভালো, যদি আরও কিছু প্রশ্ন থাকে নবগোপাল বুঝিয়ে দেবে। ও এখানে বড় ভালো ছিল। সবচেয়ে বড় কথা আমার মনের সঙ্গে একটা সেতু মতন তৈরি হয়ে গেছে। হাত বাড়ালে ও ঠিক বুঝে যেত জল চাইছি না চা। মুখ ফুটে বলার প্রয়োজন হত না।
কি করব কর্তামশাই শরীর যে দিচ্ছে না। নবগোপাল বিনীতভাবে বলে।
সেইজন্যেই তো জোরাজুরি করিনি, দৃঢ় সংযত স্বরে কর্তামশাই বলেন, নইলে তুমি যতদিন আছ এখানে এই বাড়ির ইট, কাঠেরও বোধহয় তোমার উপর জোর ফলানোর অধিকার জন্মে গেছে। আমি তো করতেই পারি। যাক যখন পারছ না কী করা যাবে। এই ছেলেটিকে সবকিছু বুঝিয়ে বলে দিও। ছবিগুলো যেন সাফসুতরো থাকে, ঘরদোর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর দরজা জানলার কথা .....।
বৃদ্ধ কথা শেষ না করে হঠাৎ থেমে যান।
নব এইসময়ে গোকুলকে বলে, চলো বাইরে যাওয়া যাক। কর্তামশাই বোধহয় কিছু চিন্তা করছেন।
দোতলায় সারি দিয়ে কয়েকটা ঘর। একপাশে সাদা মার্বেল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে আসে গোকুল। বাড়ির মধ্যিখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা ঘিরে ওপরে নিচে সারি দিয়ে ঘর ও সংলগ্ন বারান্দা তৈরি করা হয়েছে। দোতলায় ছাদ থেকে সেই ফাঁকা জায়গায় উপর রঙিন বাহারি ফাইবার গ্লাস ঘেরা। ফলে বৃষ্টির জল বা চড়চড়ে রোদ কোনওটাই বাড়ির ভেতর আসতে পারবে না। তবে এই বাহারি ফাইবার মনে হয় রোদজল আটকানোর জন্য পরবর্তীকালে লাগানো হয়েছে। নইলে এই বিশাল প্রাসাদের যা বয়স তখন এই হাল ফ্যাশনের ফাইবার গ্লাস দিনের আলো দেখেনি।
নিচে এসে নবদার ঘরের দিকে যেতে যেতে গোকুল প্রশ্ন করে, কর্তামশাই দরজা জানলার ব্যাপারে কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন?
ওই পুবদিকের দরজা জানলা সকালবেলা খুলে দিতে হবে। তেনার মতে পুবের প্রভাতী রোদ বাড়ির স্বাস্থ্যের পক্ষে দারুণ। সকাল ন'টা নাগাদ রোদ চড়া হলে দরজা জানলা বন্ধ করে ফের দুপুর বারোটার পর খোলা। তখন যে সূর্য পশ্চিম ঢালে। আবার সন্ধেতে সব বন্ধ। এই আর কী। রোদ অনুযায়ী পশ্চিমদিকেও একই ব্যবস্থা। মোদ্দা কথা হল ঘরে যেন প্রখর রোদ না ঢোকে, আবার একদম আলো না এসে যেন স্যাঁতস্যাঁতে না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখা। ও কিছু নয়, দু'দিন করলেই ঠিক হয়ে যাবে। তখন দেখবে আপনা থেকেই কেমন দরজা জানলা খোলা দেওয়া করছ। পুব পশ্চিম কিছু চিন্তাই করতে হচ্ছে না।
নবগোপালের ঘরে ফিরে আসে গোকুল। আজ সকালে নিবারণের সঙ্গে প্রথমে এখানেই এসেছিল। শেকল থেকে ছোট কুলুপ খুলতে খুলতে নব বলে, তালা দেবার দরকার পড়ে না, তবু অভ্যেস হয়ে গেছে।
ঘরটায় একটা ছোট খাট, আলনা, দেরাজ, বড় আয়না, ছোট চৌকি, জলের জায়গা আর একপাশে প্রচুর দেবদেবীর ছবি আছে। খাটে বিছানা ধোপদুরস্ত, পাশে চৌকিতেও ছোট বিছানা আছে।
নবগোপাল ঘরে ঢুকে বলে, এই হল তোমার নিবাস।
বেশ ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছেন দেখছি।
কি আর করব সারাদিনে তেমন কাজ নেই যে। যা করি পরিষ্কার করে করি। চলো ওপাশে রান্নার জায়গা আর কলঘর দেখিয়ে দিই।
রান্নাঘরটি ছোট হলেও পরিপাটি করে গুছানো। প্রতিটি সরঞ্জাম সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রাখা। এমনকি ছোট, বড় নানা কৌটোয় চাল, ডাল, চিনি,মশলা ভরা আছে। মশলার কৌটোগুলোতে নাম লিখে স্লিপ সাঁটা। ঘরের একপাশে গ্যাস সিলিন্ডার। সামনের ঘরে ঢোকার সময় আর একটি দেখেছে।
আপনার বেশ গুছানো স্বভাব দেখছি, গোকুলের কণ্ঠে বিনয়। আমি কি এত গুছিয়ে করতে পারব?
অভ্যেস করলে ঠিক হবে। আমার বাবা বলতেন, যা ভাববি তাই করতে পারবি। খালি মনেতে বল রাখতে হবে যে আমি পারব।
কলঘরে চৌবাচ্চা দেখিয়ে নবগোপাল বলে, ফি সকালে জল ভরে নিলে নিশ্চিন্তে থাকবে। ওপাশে রান্নার জায়গাতেও কল আছে, জল নিয়ে নেবে। আর তেনার জল ওই বাড়ির শোধনযন্ত্র লাগানো কলের। সকালে সেখানে থেকে ঘড়া ভরে দেবে। যাক এখন চান করে নাও। নিবারণ আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে একজনকে নিয়ে আসতে পারে। তাই তিনজনের রান্না করে রেখেছি।
আগে কর্তামশায়েরটা দিয়ে আসি।

।। ৪ ।।

দুপুরের খাওয়াটা খুব ভারী হয়ে গেল গোকুলের। আসলে পেটটা যে গ্রীষ্মের ফাটা মাঠ হয়েছিল। নববর্ষের প্রথম জল যেমন সেই ফাটা ফোদলে সেঁধিয়ে যায়, নবর দেওয়া খাবারও পেটের খাদে তলিয়ে গেল। আয়োজনও ছিল দেদার। আসলে এখানে বোধহয় বাদবিচার নেই, মনিব যা খান, চাকরও তাই ভাগ পায়। ফলে শুক্তো, পোস্তর বড়া, পার্শে মাছ ভাজা, সোনামুগ ডাল, পোনামাছের কালিয়া আর চালতার অম্বল খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর যখন তুলল পেট ফুলে আইঢাই। এরপর এক গ্লাস জল খেতেই চোখ যেন টেনে ধরল।

নব তাকে বলেছিল, ইচ্ছে হলে খাটেও শুতে পার, তুমিই তো থাকবে। কিন্তু গোকুল ভরসা পায়নি। যে শোয় সে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ওই খাটে গোকুল শোবে না। নব চলে গেলে আলাদা কথা। সে চৌকিতে লম্বা হয়েছিল। কখন যে চোখ বুজে এসেছে জানে না।

চোখ মেলে তাকাতে দেয়ালে টাঙানো ঘড়িতে দেখে পাঁচটা বেজে গেছে। সে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে বসে বলে, নবদা আছো? কোনও সাড়াশব্দ নেই। যাহ্ বুড়ো কোথায় আবার সেঁধোলো? সে গলা তোলে , নবদা কোথায় গেলে?

এবারও উত্তর না পেয়ে গোকুল চৌকি থেকে নেমে ঘর, রান্নাঘর, চানঘর সব খুঁটিয়ে দেখে । কোথাও নবগোপালকে দেখতে পায় না। সে এখানে কাজে বহাল হয়েছে ঠিকই, তবে দু'চার দিন পুরোনো লোক না দেখিয়ে দিলে কাজে সড়গড় হবে কীভাবে? চিন্তার অকূল পাথারে ভাসতে ভাসতে সে দরজা খুলে বাইরে আসে। অক্টোবর মাস হওয়াতে পাঁচটা বাজতে না বাজতে বিকেলের আলো ম্লান হতে শুরু করেছে। একটু তফাতে পুরো দৃষ্টি জুড়ে দাঁড়ানো পেল্লাই রাজপ্রসাদের গায়ে গোধূলির শেষ আলো লেপটে যাচ্ছে। প্রাসাদের সাদা রঙে মেটে লাল রঙের আভা। তার গায়ে বিধূর বিষণ্ণতা থমকে আছে। আসলে একটু আগেই সাদা রঙের প্রাসাদটি উজ্জ্বল হয়েছিল, কিন্তু শেষ বিকেলে মন কেমন করা আলো মেখে সে কেমন অনুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ওপাশের বাগানে বড় বড় গাছে পাখিরা বাসায় ফিরছে। বাইরের এই ছড়ানো ছিটানো নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে গোকুল ফের হাঁক পাড়ে, নবদা আছো নাকি?

কিন্তু বৃথা সেই ডেকে ফেরা। তাঁর বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর শূন্য বাড়ির প্রোকষ্ঠে ঘুরে ঘুরে ফেরে। প্রত্যুত্তর করার মতো কেউই বাসায় নেই।

খানিক বাদে গোকুল নিশ্চিত বোঝে নবগোপাল আর এখানে নেই। তাকে এই বাড়ির কাজে বহাল করেই সটকে গেছে। এত কিসের তাড়া ছিল! গোকুল বুঝতে পারেনি। ঘড়ির দিকে চোখে পড়ে - পাঁচটা পনেরো। সাড়ে পাঁচ নাগাদ কর্তামশাই বিকেলের চা খান। সে কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কর্তামশাই বিকেলে শুধু চা পান করেন না সঙ্গে হালকা কিছু খান? জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে সে উপায় নেই। যে বলতে পারত সেই নবগোপাল পগারপার। তাকে কাজে কিছুটা সড়গড় করে গেলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত? গোকুল এমন আতান্তরে পড়ত না। দোনামোনা করতে করতে গোকুল খানিক নোনতা সুজি করা মনস্থ করে। কিন্তু সুজি তৈরি করার সময় এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। সে খাবারটা তৈরি করছে বটে, কিন্তু তার নিজস্ব ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনও দাম নেই যেন। সে কেবল খুন্তি ধরে আছে, চালনা করছে যেন অন্য লোকে। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি।

> বাহারি কাজ করা পালঙ্কের উপর আধশোয়া বৃদ্ধের বয়স আন্দাজ করা শক্ত। আশির ওপর তো বটেই নব্বইও হতে পারে। তবে চামড়া লোলচর্ম নয়। সাদা ধুতি পরনে । গায়ে ঘিয়ে রঙের বেনিয়ান, ওপর দিকে তিনটে বোতাম থাকলেও লাগানো হয়নি।

আবার নুন দেওয়ার সময় যেই কৌটোর জন্য হাত বাড়িয়েছে, চোখ চলে গেল অন্য এক কৌটোর দিকে যেখানে লেখা-গরম মশলা। নবদা দারুণ গুছিয়ে কাজ করে গেছে, মশলার কৌটোর গায়ে নাম অবদি লিখেছে। যখন পাওয়াই গেল গরম মশলা তা কড়ায়ে দিয়ে সুজি মিশিয়ে বেশ করে কষে নিল। তৈরি হলে একটু মুখে ফেলে স্বাদ নেয়, আহা যেন অমৃত। সে নিজে ভাল রান্না করে ঠিকই কিন্তু এই দুর্ধর্ষ স্বাদ সে কি আগে কখনও আনতে পেরেছে? ধন্দে পড়ে যায়। যাকগে অত চিন্তায় কাজ নেই, চায়ের সঙ্গে ওটা যাবে ভাল। তার মা বলত ওরে বড়লোকের কাছে কিছু নিয়ে যাওয়া ভাল। পুরো খালি হাতে যেতে নেই। এখনই নোনতা সুজি যদি তেনার মুখে রোচে তাহলে আর কথাই নেই। নইলে...নাহ্ আর চিন্তা করে লাভ নেই। মনে কেবল উদ্বেগের বোঝা বাড়ানো। যদি নবদা কিছু বলে দিয়ে যেত... এত সাত তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন? একদম কিছু না বলে। এই প্রথম নবগোপালের ওপর রাগ হয় গোকুলের।

সুজি দামি ক্যাসারোলে ভরে নিয়ে সুদৃশ্য কেটলিতে চা নিয়ে দোতলায় পৌঁছে যায় গোকুল। এই বাড়িতে ঘরগেরস্থালির মেলা জিনিস। নবগোপাল একটা কথা বলেছে, কোনও কিছুতেই কার্পণ্য করবে না। যে জিনিসে যা লাগবে সঠিক পরিমাণে দেবে। কম হলে তিনি রাগ করবেন। আর গেরস্থালির জিনিস ফুরিয়ে গেলে চিন্তা নেই। দোকানে কেবল বলার অপেক্ষা, মাল গোকুলের কাছে পৌঁছে যাবে। আর টাকার প্রয়োজন পড়লে কর্তামশাইকে বললেই তিনি বেয়ারার চেক কেটে দেবেন। হরিদেবপুর গিয়ে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে আসতে হবে।

সকালের মতো নির্ভার মনে কর্তার ঘরে যেতে পারে না গোকুল। বুকে যেন পাষাণ ভার, কর্তামশাইয়ের সামনে গেলে তিনি কি বলবেন, নব চলে যাওয়াতে দীর্ঘ দিনের সঙ্গীর বিরহ কাতর মনের মর্জি কোন পথে আবর্তিত হবে সেই চিন্তায় সে সিঁটিয়ে থাকে। কোনও গতিকে দরজা ঠেলে ভেতরে পা রেখেছে, সেই সুরেলা কর্তৃত্ব কানে আসে, তোমার

সময় জ্ঞান আছে। এই সময় আমি চা খাই?
গোকুল দেখে কর্তামশাই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের বাগানের দিকে চেয়ে আছেন। শেষ বিকেলের আলো নিভে গিয়ে বাইরে সন্ধ্যা নামছে ধীরে ধীরে। ধূসর আচ্ছাদনের পাতলা পর্দা ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। প্রকৃতির বুকে বাইরের বাগানের গাছে দলে দলে পাখিরা কোঠরে ফিরছে। প্রাক সন্ধ্যার মুহূর্তে কেমন এক বিষণ্ণতা ছড়িয়ে আছে চারিধারে। আর সেই বিধুর বিষণ্ণতা এই অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য প্রাসাদের অগুনতি রুদ্ধ প্রোকোষ্ঠে করুণ বার্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিষাদময় আবহ এই প্রাসাদের অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে, যেন এক দক্ষ বেহালা বাদক নিবিড় নিপুণতায় করুণ রাগিণী তুলে ধরছে, ত্রস্ত গোকুল আরও বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং অনতি ভবিষ্যতে তার বিড়ম্বনা আর কতগুণ বাড়বে সে চিন্তায় কাতর হয়।
চারপাশে ঘনিয়ে আসা শীতল নীরবতা ভেঙে কর্তমাশাইয়ের কণ্ঠস্বর কানে বাজে, তবে আজ আর একা খাব না, কয়েকজন অতিথি অভ্যাগত আসছেন কাজের ব্যাপারে। চলো ওঘরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে।
গোকুল হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ভাগ্যিস সে বাড়তি চা নিয়ে এসেছে কেটলিতে। কেমন মনে হয়েছিল, কেবল দু'কাপ চা যথেষ্ট নয়, অন্তত ছ-সাত কাপ চাই।
শোবার ঘরের আগে বসার ঘর। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকেন কর্তামশাই। পেছনে চা খাবার হাতে সাবধানী গোকুল। এই বসার ঘরটি যথার্থ রাজকীয়। ডিম্বাকৃতি বিশাল টেবিল ঘিরে সুদৃশ্য দশ বারোটি রিভলভিং চেয়ার। দামি মেহগনি কাঠের টেবিলে কালো ঘেঁষা চকচকে বার্নিশ। ঘরটির মাপ পঞ্চাশ ফুট বাই ষাট ফুট হবে। দুই ধারে প্রায় সাত ফুট লম্বা আয়না ভারী এবং মহার্ঘ ফ্রেমে বাঁধানো। এই ঘরের মেঝে সাদা মার্বেলের ধারে কালো বর্ডার ঘেরা। টেবিলের ওপরে সিলিং থেকে ঝোলানো চোখ ধাঁধানো ঝাড়লণ্ঠন। কর্তামশাই সুইচ টিপতে আলো জ্বলে উঠল। জোরালো নয় সেই আলোর সামগ্রিক উদ্ভাস, কেমন এক চিকন দ্যুতি ছড়িয়ে গেল সারা ঘরে।
গোকুল অবাক হয়ে দেখে টেবিলের ওপর আটটি কাপডিশ সাজানো। এত পরিপাটি আয়োজন কে করল ভাবনাটা মাথায় সেঁধোতে না সেঁধোতে মোলায়েম কতৃর্ত্বের স্বর কানে ভাসে, খাবার আগে নবকে বললাম গোছাগাছ করে দিতে।
ওহ সেই কেবল জানে না নবদার চলে যাবার কথা, এখানে তো ঠিক বলে গেছে। আর কর্তামশাই কেমন যেন অদ্ভুত। তার যে ভাবনা মনে আসছে অমনি ঝপ করে যেন দৈববাণীর মতো তাঁর গলায় উত্তর শোনা যাচ্ছে। হয়তো নিজের হিল্লে হলেও এই বাড়ির পরিবেশ এবং কর্তামশাই নিজে অতীব অদ্ভুত ধরনের। আর এই প্রাসাদের প্রবেশ করা থেকে সে নিজে কেমন যেন সতর্ক হয়ে আছে। অচেনা পাহাড় জঙ্গলে গেলে মানুষ যেমন অতিরিক্ত সাবধানী হয় অনেকটা সেইরকম। এত সব বিভিন্ন ব্যাপার ঘটার ফলে গোকুলের নিজস্ব চিন্তাভাবনা গুলিয়ে যাচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে হিল্লে হল, পরক্ষণে মনে হচ্ছে সামনে ঘোর বিপদ। কী যে হবে বোঝা যাচ্ছে না মোটেই। হিত আর বিপদ ঘটার বিপ্রতীপ ভাবনায় পিষ্ট হতে হতে কী এক সর্বগ্রাসী কুহকি মায়ায় সে আবিষ্ট নিমজ্জিত হতে চলেছে। এই মায়াপাশ রচনা করেছে এই অদ্ভুত বৃদ্ধ তাঁর ততোধিক অদ্ভুত বাসস্থান। বাড়িটি যেন জড় নয় রীতিমতো প্রাণের বহমানতা তার অঙ্গে অঙ্গে একান্ত প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের মতো সে কোনও নবাগতকে পেঁচিয়ে নেয় আপন অবয়বে, তারপর তীব্র বিষক্রিয়ায় সেই অভাগা অভ্যাগতকে প্রথমে চিন্তাভাবনায় নীল করে তোলে, এরপর ক্রমে ক্রমে তার স্বর্গীয় চিন্তাধারা শুষে নিয়ে তাঁকে যান্ত্রিক রোবটে পরিণত করে তোলে। সে তখন আজ্ঞাবাহী দাসানুদাস, যেমন হয়েছিল নবদার পরিণতি। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

কী যে হবে বোঝা যাচ্ছে না মোটেই। হিত আর বিপদ ঘটার বিপ্রতীপ ভাবনায় পিষ্ট হতে হতে কী এক সর্বগ্রাসী কুহকি মায়ায় সে আবিষ্ট নিমজ্জিত হতে চলেছে। এই মায়াপাশ রচনা করেছে এই অদ্ভুত বৃদ্ধ তাঁর ততোধিক অদ্ভুত বাসস্থান।

শোনো, টিপটে টেবিলের মাঝে রাখো। এখনই কাপে চা ঢালার প্রয়োজন নেই। আমায় শুধু এক কাপ চা দাও। দরকার হলে গেস্টরা নিজেরা নিয়ে নেবে। আর ক্যাশারোলে ওটা কি?
আজ্ঞে নোনতা সুজি চায়ের সঙ্গে খেতে ভালো লাগবে। আজ এখানে অনেকে আসবেন বুঝি?
এই প্রশ্নে কর্তামশাইয়ের মুখে ভাঁজ পড়ে। ভ্রূকুটি করে গোকুলকে দেখতে দেখতে বলেন, তুমি কেবল প্রশ্নের জবাব দেবে। নিজে কোনও প্রশ্ন করবে না। একথা নব বলে দেয়নি?
আজ্ঞে না।
যাক আশা করি মনে রাখবে। আর পেছনের আলমারি থেকে বাটি চামচ বের করে কাপ ডিশের পাশে রাখ। কারোর সুজি খেতে ইচ্ছে হলে নিয়ে নেবে।
এতক্ষণ চোখে পড়েনি। গোকুল এবার দেখে পেছনে দুইপাশে দেওয়ালে তিনটে করে বড় আলমারি। এর মধ্যে চারটেতে দেশিবিদেশি কাচের পুতুল সুবিন্যস্তভাবে সাজানো। বাকি দুটি আলমারিতে মহার্ঘ ক্রকারি। এত সুন্দর কাচের বাসনের শেড দেখলে তাক লেগে যায়। গোকুল সন্তর্পণে আলমারি থেকে আটটি বাটি আর চামচ বের করে আনে। তারপর টেবিলের ওপর রাখা কাপের পাশে সাজিয়ে দেয়। কাজ শেষ করে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে।
শোনো এবার তুমি যেতে পারো, মোলায়েম কর্তৃত্বের স্বরে বলেন, রাত নটা নাগাদ এসে কাপডিশ ধুয়ে মুছে তুলে দেবে। আর রাতের খাবার আমি দশটার মধ্যে খাই।
আজ্ঞে ঠিক আছে, গোকুল মিনমিন করে বাইরে দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু বাইরে বেরিয়েও মন ওই ঘরে ফিরে ফিরে যেতে চায়। এক অদম্য কৌতূহলে সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। কী হবে ওই ঘরে আজ এই সান্ধ্য আসরে? এমন জমায়েত কি প্রায়ই হয়? কই নবদা তো কিছু বলে গেল না। কেন এই গোপনীয়তা? তবে কি গূঢ় কোনও রহস্য কি লুকিয়ে আছে এর মধ্যে? চিন্তার এক ভারীস্রোত গোকুলের শিড়দাঁড়া বেয়ে নামতে থাকে। সে দারুণ ভয় ত্রস্ত হয়ে ওঠে।
তবে একই সঙ্গে কৌতূহলের চোরাস্রোত ভর করে তাকে। এখানে আজ লোকজন আসবে কেন? কী হবে আজ? মাঝে মাঝে যে এই বাড়িতে লোক সমাগম হয়, কই নবদা বলেনি তো? নবদা কী বা বলেছে? কিছু খবর না নিয়ে কাজের সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই অতি বৃহৎ প্রাসাদে এসে উঠেছে। কিছুই জানে না এই শূন্য রাজপুরির ব্যাপারে। তবে আড়লের ঘেরাটোপ থেকে যদি ঘরের ভেতরে চলতে থাকা দৃশ্য দেখতে পায় তাহলে হয়তো কিছু ধারণা হতে পারে। এই বিশাল বাড়ির ব্যাপারে কিছু জানতে হবে। আবার কর্তামশাই কোনও টের পাবেন না তার জানার কথা। গোকুল এই বিশাল ঘরের সঙ্গে মানানসই এক বড় জানালার পাশে দরজার আড়ালে এমন ঘাপটি খুঁজে বের করল যে ঘরের ভেতর থেকে তাকে দেখা যাবেই না। আবার বাইরে থেকে কেউ হঠাৎ করে ঘরে ঢুকলেও তাকে দেখতে পাবে না কোনও মতে। লুকোনো জায়গা ঠিক করতে পেরে সে খুশি হয়। তবে এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হতে পারে। ঘরের ভেতরে চলতে থাকা ঘটনার মাঝপথে তো আর চলে যেতে পারে না। সুতরাং তার নিজের ঘরে কুলুপ দিয়ে আসা ভালো। সে ধীর পায়ে নিচে যায়।
নীচে নেমে একতলা সিঁড়ির পাশ দিয়ে তার ঘরে যাবার রাস্তা। তবে

ওদিকে কেবল বাগান, পুকুর আর তার ঘর রান্নাঘর এইসব। এই বাড়িতে ঢোকা এবং বাইরে বেরনোর রাস্তা এই মূল বাড়ির সঙ্গে সংযুক্ত। ঘরে যেতে যেতে দৃষ্টি চলে যায়। আম, জাম, কাঁঠাল, বাতাবিলেবু, জামরুল এইসব ফলের বড় বড় গাছ আছে। আর জবা, টগর, কলকে, কদম, করবী, শিউলি, জুঁই ফুলের গাছ তার নজরে আসে। টগর আর জুঁই ফুল ভরে আছে। কলকে গাছের পাশ দিয়ে বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে এক বড় পুকুরের দিকে। আসন্ন সন্ধ্যায় বৃক্ষের ছায়ায় ওই পুকুরের জল গাঢ় সবুজ। অতীতে এই পুষ্করিণীর শান্ত গভীর জল আর তীরবর্তী গাছের ছায়া কত শান্ত প্রাণের ক্লান্তি দূর করে তাকে সজীব সতেজ করে তুলেছে। আজ এই মর্মর প্রাসাদে তেমন প্রাণীই নেই। তাই স্বস্তি ক্লান্তি দূর করার জন্য প্রয়োজন নেই। কেবল ভরাট কালো জল আর তার তীরের অজস্র গাছপালা নিয়ে একান্তে অবোধ অনাথ বালকের মতো পড়ে আছে আর গাছেরা এমন পরপর সারি দিয়ে সাজানো যেন তারা এই নাতিবৃহৎ পুষ্করিণীকে প্রহরা দিচ্ছে। যাক পরে এসে ভালো করে দেখা যাবে। গোকুল নিজে ঘরে দিকে পা বাড়ায়। এখনই দেখে দুটো শিউলি গাছ কুঁড়িতে কুঁড়িতে ছেয়ে গেছে। কাল সকালে ফুলে ভরে যাবে। এই গাছ দুটো তখন আরও বেশি সুন্দর লাগবে। গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক দমকা বাতাস শিউলি গাছের ওপর দিয়ে বয়ে এসে তার গায়ে লাগে। গাছ দুটো ঝুঁকে পড়ে যেন তাকে অভিবাদন জানায়। সমস্ত দেহমন সুরভিত হয়ে গেল এক অনিন্দ্য সৌরভে। শিউলি ফুলের তো অন্য সুবাস, তবে এমন বিমোহ করা গন্ধ আসছে কোথ থেকে? এই বাড়িটা ক্রমে ক্রমে যেন ভালো লাগতে শুরু করেছে। গোকুলের সবই এখন ঠিকঠাক লাগছে কেবল কর্তামশাই কেমন যেন অদ্ভুত প্রকৃতির।



কিন্তু খানিক আগে সে যে ভয় ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল আবার এই মুহূর্তে এই সন্ধ্যালোলিত মায়াবি পরিবেশ কেমন যেন ভাল লাগতে শুরু করেছে। এই দুই বিপরীত মেরুর ভাবনা কেন জুড়ে বসছে তার মনে? তবে কি এই প্রাসাদের কোনও সম্মোহনী শক্তি আছে? ধীরে ধীরে মানুষের স্বকীয় বিচার বুদ্ধি, চেতনা গ্রাস করে ফেলে। তখন আর নিজের কোন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকে না ঠিক যেমন হয়েছিল নবগোপালের বেলায় এই বাড়ির মায়াজালে বন্ধ হয়ে যায় গোটা জীবন কাটিয়ে গেল এখানেই। ঠিক তেমন বিরাট কি হতে চলেছে গোকুলের ক্ষেত্রে? তবে এই কুহকী প্রাসাদ তাকে বেড়াজালে আবদ্ধ করার আগেই সে চলে যাবে। খেতে যদি না পায় ঠিক আছে, তবু এই লজে নাগপাশে থেকে তার মুক্তি চাই সে জানিয়ে যাবে এখান থেকে এবং তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। হয়তো আজ রাতে সে চেষ্টা করে দেখবে। দেরি করলে সে মায়া বন্ধনে জড়িয়ে যাবে। তবে আজ আবার কারা যেন এই প্রাসাদে আসবে। এই বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত আসে তাহলে! চাপা কৌতুহলে কেন গোকুল ঘরে তালা দিয়ে দোতলায় কর্তামশাইয়ের বসার ঘরের পাশে লুকনো জায়গায় ফিরে আসে।

গুড ইভনিং এভরিবডি, আজ সন্ধ্যায় আপনারা আমার আঁকা ছবি দেখতে বা কিনতে যে এই বাড়িতে এসেছেন তাতে আমি সম্মানিত। আশা করি, বেশ কিছু ছবি আপনাদের পছন্দ হবে। কেননা এইসব ছবি একদম গভীর অভিনিবেশ আর তীব্র ভালবাসা দিয়ে তৈরি। তবে তার আগে আপনারা সবাই চা ও সামান্য জলযোগ করে আমাকে অতিথিসেবার সুযোগ দিন। ফাঁকা বড় ঘরে কর্তামশায়ের সুরেলা কণ্ঠস্বর কানে এলেও কাউকে দেখতে পায় না গোকুল। একী ভীষণ মায়াবিভ্রম! বৃদ্ধ চিত্রকর খানিক আগে যা বললেন বা ভেসে আসা সমবেত ধ্বনি থেকে বোঝা যায় যে কোনও এক সভা চলছে এই হলঘরে। অথচ কাউকে দেখা যায় না। কায়াহীন অভ্যাগতদের এই ভয়ঙ্কর উপস্থিতি গোকুলের মনের কন্দরে কন্দরে ভয়ের বাতাস ভরিয়ে তোলে। সে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকে।

এই চা খোদ মকাইবাড়ি থেকে আনা। সারা কলকাতায় এমন চা দুর্লভ। তবে স্বাদ কেমন হয়েছে জানি না। কেননা এক নতুন রাঁধুনি নিযুক্ত হয়েছে। নুব, না না রানার তৈরি চা পান করে আপনারা তৃপ্তি পান। বাহ্ রাজবাড়ির রাঁধুনি রানা, মিল হয়েছে দারুণ... এক বাঙালি কণ্ঠ শোনা যায়। এই ছবিটি কত বলিছ? গোল পাহাড়ি পথে বাঁক নেওয়া এক ট্রেনের ছবি দেখিয়ে এক সাহেব কণ্ঠ প্রশ্ন করে।

আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কেবল ছবির দিকে ছোট স্টিক দিয়ে নির্দেশ করা হচ্ছে। অথচ সেই স্টিক ধরে আছে যে হাত বা তার মালিককে দেখা যাচ্ছে না। এই দৃশ্য দেখে গোকুল ভয় সিঁটিয়ে গিয়ে দরদর করে ঘামতে থাকে। মাথার চুল প্রায় খাড়া। একি ভয়ানক পরিবেশে পড়ল সে? শেষে বেঘোরে প্রাণ যাবে না কি? গরিব হলেও তার মনে শান্তি ছিল? এখানে এসে প্রথমেই সেই মানসিক প্রশান্তি উবে গেছে।

ঠিক সেই সময়ে আমদের পুষ্করিণীর দিক থেকে এক চঞ্চল বাতাস এসে এসে হলঘরে ঢোকে। মনে হয় যেন নিভৃত পথচারীরা ওই বাগান বিলাস ছেড়ে এই প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল। যেখানে অনতি অতীতে তাদের পরমপ্রিয় বাসস্থান ছিল। সেই বনে প্রাণহীন কিছু জড়বস্তুর উপস্থিতি তাঁদের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত। অথচ উপায় নেই হয়তো। নইলে কবেই তারা তাদের প্রিয় বাসস্থান থেকে এই জড়ছবিগুলিকে স্থানান্তরিত করত। এই সন্ধিক্ষণে প্রতি পদে উজ্জ্বল চন্দ্র আকাশে সমুজ্জ্বল উপস্থিতি ঘোষণা করে ক্রমশ আরও তীব্র, আরও মোহময় হয়ে উঠতে লাগল। দোতলার বারান্দার লুকনো জায়গা থেকে ওই বাগান ও পুকুরের দিকে

তাকিয়ে গোকুলের মনে হল আদি অনন্তকাল থেকে একই নিয়মে এখানে দিনরাত আবর্তিত হচ্ছে ও এই বৃহৎ প্রাসাদের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বাসিন্দারা প্রকৃতির সেই ধরাবাঁধা নিয়মের নিয়ত দ্রষ্টা। সেই কেবল অনাহুত একজন, দুর্ভাগ্যের নিষ্করুণ মুষ্ঠির হাত ধরে সে নিয়তিতাড়িত হয়ে অভিমন্যুর মতো এই চক্রব্যূহে প্রবেশ করেছে নিষ্ক্রিয় মনে কোনও নিয়ম না জেনে। নিজের উপর নিষ্ফল এবং অন্ধ ক্রোধে গোকুল বিবশ হয়ে ওঠে।

ওটা বাতাসিয়া লুপে টয়ট্রেনের ছবি। দার্জিলিংয়ের নিসর্গ দৃশ্য ছবির ক্যানভ্যাসে ফুটিয়ে তুলতে দারুণ পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং এই ছবি মনে হয় উচ্চপ্রশংসিত হবে। পঁয়তাল্লিশের কমে হবে না কিছুতে। ফরটি ফাইভ থাউজ্যান্ড ইজ টু মাচ। যদিও যুদ্ধ শেষে সবকিছু দামি হইয়াছে, তবু টু মাচ... আমি ফরটি পর্যন্ত দিতে পারি। তাও তুমার ছবি এবং এই ছবি ট্যুরিস্ট অফিসে দারুণ লাগিবে বলে নিতেছি। যুদ্ধের পরে দেশ গড়ার জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেন পর্যটন শিল্পে জোর দিয়েছেন। গমগমে সাহেবি গলা প্রায় গর্জে ওঠে। জন লর্ড আরউইন। আপনার কথার সম্মান রাখার জন্য আমি চল্লিশ হাজারে রাজি হচ্ছি। কর্তামশায়ের কণ্ঠস্বরে সেই চেনা কর্তৃত্ব মিশে আছে। একি নাটক চলছে এখানে! যুদ্ধ মানে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ? সাহেবদের আমলে সেটাই তো শেষ যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে যে বহুকাল আগের ঘটনা। কোন মায়ায় সেই শুধুর অতীত ফিরে এল? তবে কি কর্তামশাই দক্ষ যাদুকর? ইচ্ছে করলেই তিনি সুদূর অতীত মায়াজালের সাহায্যে বর্তমানে নিয়ে আসতে পারেন এবং ঘটমান বিষয়ের সঙ্গে পুরো মিলিয়ে দিতে পারেন। তিনি দক্ষ চিত্রী, দোর্দণ্ডপ্রতাপ মালিক এবং এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তিনি দৃঢ়চেতা অতীত সৃষ্টিকারী। কোনও অতীতই বোধহয় পুরো মিলিয়ে যায় না, মহাকালের সুগভীর সরণিতে কেবল নিমজ্জিত থাকে। বইয়ের সূচিপত্রের মতো তাদেরও নির্দিষ্ট বিলয়বিন্দু থাকে। সন্ধানী যাদুকর কেবল সেই নির্দিষ্ট বিলয়বিন্দুতে চাপ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেন। ঠিক যেমন এখন এইখানে ঘটে চলেছে। হঠাৎ এক ঝলক দমকা বাতাস ঘরের ভেতর থেকে বাইরের বাগানে চলে গেল। যেন অসংখ্য নূপুর নিক্বণের সুমধুর ধ্বনি তুলে সেই নিভৃতচারিণীরা দেহহীন দ্রুত গাছে কলহাস্যমুখর আলাপচারিতায় মেতে উঠে বাগানের সেই সারিবদ্ধ বীথিঘেরা গভীর পুষ্করিণীর দিকে চলে গেল। যাওয়ার সময় এক বিমোহিত সৌরভে বকুলের সর্বাঙ্গ পুলকিত হয়ে গেল। কী এক সম্মোহনে তাড়িত হয়ে সে বাগানের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রইল। কিন্তু নির্ঝরের অবিরাম শব্দের মতো কেবল এক কলধ্বনি ছাড়া কিছুই শোনা গেল না। আর কাউকে দেখা তো গেলই না।

এই নিভৃত প্রাসাদপুরীর এইসব অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখে গোকুল ক্রমে ক্রমে আড়ষ্ট হয়ে যায়, তার চিন্তাভাবনা কাজ করে না। হাতপায়ে খিল ধরে যায়। বুকেতে সাতমণ পাথর যেন। অবস্থা এমনই, সে ওই জায়গা ছেড়ে নড়তে পারে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে দৃশ্য দেখতে থাকে। বাহ্ হাওড়া ব্রিজের এই ছবিটাতো ইউনিক, কত দিতে হইবে? ভাঙা বাংলা খসখসে এক ইংরেজ কণ্ঠ শোনা যায়। হাওড়া ব্রিজের ছবিটা কেমন যেন চেনা লাগে গোকুলের। ওহ এই ছবিটাইতো তাদের চর্তুথ শ্রেণির ভূগোল বইতে দেখেছিল। শিল্পী ছিল...খানিক ভাবতেই মনে পড়ে তার –সাসা। পুরো নাম সত্যসুন্দর সাহা। সংক্ষেপে সাসা নামেই বিখ্যাত হয়েছিল সেই শিল্পী। তখনই মনে পড়ে এই রাজপ্রাসাদের মতো বাড়িটায় ঢোকার সময় দরজার পাশে আটকানো নেমপ্লেটে নাম দেখেছিল-সাসা লজ। তখন বুঝতে পারেনি, এখন বুঝল মালিকের নামই বাড়ির নাম। এদিক ওদিক ইতস্ততভাবে তাকাতে তাকাতে ক্রকারির আলমারির ওপরে এক বড় অয়েল পেন্টিং দেখতে পায়। নীচে লেখা শিউলি সাহা, জন্ম ১২.১১.১৯২৩, মৃত্যু ২০.০২.১৯৮০। তার মানে প্রায় তেত্রিশ বছর আগে এই বাড়ির কর্তা গত হয়েছে। তারপর থেকে এই চিত্রকর একা এই বাড়িতে থাকেন। সঙ্গে এতদিন যাবৎ থাকত নবগোপাল। এবার থেকে গোকুল। ওনার ছেলে-মেয়ে কোথায়? তবে এই বাড়িতে শিউলি গাছের যা বাহার আর বাড়ির বিগত কর্ত্রীর নামও যখন শিউলি, এই প্রাসাদের নাম অনায়াসে শিউলি লজ রাখা যেতে পারত। বস্তুত সেটা বেশি মানানসই হত।

খানিকটা সময় কেটে গেছে। নিজের ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করলেও যেতে পারছে না গোকুল। ভেতরের দৃশ্য দেখার তাড়না তাকে স্থবির করে দিয়েছে। তবে ওই দৃশ্য একঘেয়ে লাগতে এইবার চারপাশে তাকাতে শুরু করে সে। সবে গতকাল কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো গেছে। সারা আকাশজুড়ে এখন ঝলমল আলো। অগনিত তারা ফুটে আছে মেঘমুক্ত নীল আকাশে। যেন চুমকির চাদর কেউ বিছিয়ে দিয়েছে মাথার ওপরে। ওপাশের দীর্ঘ বাগানে গাছে গাছে পূর্ণিমার আলো এক উজ্জ্বল ঢেউ তুলেছে। বড় বড় গাছেদের ওপরে কেবল আলো পড়েছে, গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। সেইসব জায়গায় আলোছায়ার মায়াঘেরা এক কুহকী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শিউলি গাছের ও কে? মনে হচ্ছে যেন এক নারী সাদা জড়ির শাড়ি পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে চাঁদের



আলো নানা বিভ্রম তৈরি করে সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয় গোকুল। কিন্তু দৃষ্টি সরাতে পারলেও মন বড় উদভ্রান্ত হয় গোকুলের এই বিশাল প্রাসাদ তার সব প্রাচীনতা ও উদ্ভট ব্যাপারস্যাপার নিয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে ক্রমে জাঁকিয়ে বসেছে। আর এই ধু ধু শূন্য প্রাসাদের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছে এখানকার অধিবাসী প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো প্রধান ওই বৃদ্ধ চিত্রকর। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাগান জলাশয় পরিবেষ্টিত এই প্রাসাদ এবং তার মালিক চিত্রকর তাকে কেমন যেন আবিষ্ট করে তুলেছে। তার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি লুপ্ত, চিন্তধারা কোন খাতে বইছে নিজেই বুঝতে পারছে না। এমন কি যে কাজ করছে তার ওপরও নিয়ন্ত্রণ নেই। সুজি তৈরি করার সময় এটা উপলব্ধি করেছে। গোকুল গায়ে গতরে খাটা এক ছা-পোষা মানুষ, তার জীবন এযাবৎকাল এক রৈখিক। কোনও ওঠাপড়া, তাপউত্তাপ নেই সেখানে। কিন্তু আজ সকালে এখানে আশা অবধি তার জীবন-স্রোত যেন অন্য কোনও নাবালে তীব্রভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে। একে রোখার শক্তি নেই তার। তবে যতক্ষণ চেতনা আছে ওই বৃদ্ধ এবং এই বদ্ধ প্রাসাদ তাদের প্রাচীনতা আর বিশালতা দিয়ে তার দম যাতে না বন্ধ করতে পারে সে চেষ্টা প্রাণপণ করে যায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাবে। জানিয়ে যেতে গেলে বৃদ্ধ নিশ্চিত রাজি হবে না। সে পালাবে এখান থেকে আর পালানোর পক্ষে রাতের অন্ধকারই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সময়ে। তাকে দেখা যাবে না, নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাবে এই বিশাল প্রেতপুরী থেকে। এখানে সবকিছু যেন অদ্ভুত। যখন শিউলি গাছের প্রাণজুড়ানো বাতাস এসে তার গায়ে পাখির পালক বুলিয়ে দিয়ে গেল তার কেমন যেন অনুভূতি হল ওরা বলছে, কেমন লাগছে ভাল থেকো। নাহ্ এই জায়গায় সে থাকতে পারবে না। এখানে অতীতে হারিয়ে যাওয়া মানুষ এসে ছবি কেনে। বাড়ির মালিক সেই অদৃশ্য অতিথিকে সাদর আপ্যায়ন করে, গাছেরা ফিসফিস করে কথা কয়, আর বিশাল প্রাগঐতিহাসিক জীবের মতো প্রাসাদটা যেন গুঁড়ি মেরে বসে আছে যেন যে কোনও মুহূর্তে আড় ভেঙে উঠে বসে তাকে গিলে ফেলার আগে সে পালিয়ে যাবে।
ঘরের দিকে চোখ ফেরায় গোকুল। সেইখানে এখন অদৃশ্য সাহেবরা নিজেদের মধ্যে ইংরিজিতে আলাপ আলোচনা করছে। গোকুল বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারে না। কর্তামশাইকে এক নজরে দেখতে পায়। ছবিগুলো ঠিক করে রাখছেন। টেবিলের ওধারে দুই আলমারির মাঝে এক ফাদার ক্লকে ঢং ঢং করে নটা বাজলো এইবার তাকে নিজের ঘরে যেতে হবে। আজ রাতের খাবার নবদাই করে গেছে, গোকুল গিয়ে কেবল গরম করে গুছিয়ে নিয়ে আসবে। অবশ্য রাতে ইনি বিশেষ কিছু খান না। হাতেগড়া দুটো রুটি সবজি, কলা আর দুধ। সামান্যই কাজ তবু আয়োজনে যেন ত্রুটি না থাকে। চলেই যখন যাবে কিছুতে খুঁত রেখে যাবে না

কর্তামশাইয়ের কেটেকেটে বললেন মনে হয়েছিল আজ রাতে তুমি হয়তো এই বাড়ি ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করবে। কিবা করার আছে গোকুলের! এখন এই প্রেতপুরী আগলে বসে অনন্ত প্রতীক্ষা করা ছাড়া। ফাঁকা উঠনে সেই শেষ কথাটা গোকুলের কানে প্রতিধ্বনি হয়ে অন্য সুরে বাজতে থাকে-গারদে যাও।

এখন রাত দুটো। নিজের ঘর থেকে সর্ন্তপণে বাইরে এসে আস্তে শিকল তুলে দেয় গোকুল। তালা লাগায় না, কি হবে এসব জিনিস আগলানোর দায়িত্ব নিয়ে। মায়াবি আলোয় ধুয়েমুছে যাচ্ছে পাশের বাগান, ওপরের আকাশ, অসংখ্য গাছগাছালি এবং অদূরে বিশাল বাড়ি। সেই প্রাসাদে উজ্জ্বল সাদা রঙের চাঁদের শ্বেত শুভ্র আলো পড়ে তার দ্যুতি কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এত চকচক করছে পুরো প্রাসাদটা যে মনে হচ্ছে ওটা কোনও জড়বস্তু নয়, ভীষণভাবে জীবন্ত কোনও অতিকায় প্রাণী গুটিশুটি মেরে বসে আছে, এক্ষুনি হয়তো ধড়ফড় করে উঠে বসবে।
চারপাশে ছড়ানো এত আলোর মধ্যে কেবল বাগানের দিকে বড় বড় ঝাঁকড়া গাছগুলোতে আলো পুরো পৌঁছতে পারেনি, সেইখানে এক আলোছায়ার বিভ্রম তৈরি হয়েছে। বড় মায়াময় সেই বিভ্রম, গোকুলকে যেন কাছে ডাকে। সে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে রাজবাড়ির মতো বড় প্রাসাদটিকে দেখতে থাকে। ছাদের উপর বড় বড় আলসে এই চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু আলসের ওধারে ওই শীর্ণ শ্বেতবস্ত্র পরিহিত মূর্তি কার। পেছন ফেরা বলে ঠিক চেনা যাচ্ছে না, অনেকটা যেন কর্তমশাইয়ের আদল আসছে গড়নে। কিন্তু এই এত রাতে ছাদের ওপর তিনি কি করছেন? ফের সেই হাড়হিম করা ভয় ফিরে আসে গোকুলের দেহমনে। সে তাড়াতাড়ি বাগানের রাস্তা পেরিয়ে মূল বাড়ির ভেজানো দরজা আলতো হাতে সরিয়ে জোরে ঢোকে। এই বাড়ি থেকে বাইরে যাবার পথ এখান দিয়েই। আর সেই দরজা রাত দশটায় গোকুল নিজের হাতে হুড়কো তুলে দিয়ে এসেছে। কোনও তালা দেওয়া হয় না। সেই হুড়কো আস্তে আস্তে নামিয়ে... আহ্ মুক্তির যে কি স্বাদ গোকুল এবার বুঝতে পারছে। কোথায় যাবে? সুরেলা কর্তৃত্বের স্বরে চমকে উঠে গোকুল পেছন ফিরে তাকাতে কর্তামশাইকে দেখে। সবে সদর দরজায় খিলটা নামিয়েছে এমন সময়ে এই বিপত্তি। হালকা আলোয়ে কর্তামশাইয়ের মুখ দেখে গম্ভীর, থমথমে। তিনি কেটেকেটে বলতে থাকেন, মনে হয়েছিল আজ রাতে তুমি হয়তো এই বাড়ি ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করবে। তাই অনেককাল বাদে সদরে তালা দিয়েছি। এইখানে সবাই নিজের ইচ্ছেতে ঢোকে কিন্তু বেরনোর সময়ে আমার ইচ্ছে শেষ কথা। তোমার সময় হতে এখন ঢের দেরি। যাও নিজের ঘরে যাও।
কিই বা করার আছে গোকুলের! এখন এই প্রেতপুরী আগলে বসে অনন্ত প্রতীক্ষা করা ছাড়া। ফাঁকা উঠনে কর্তামশাইয়ের সেই শেষ কথাটা গোকুলের কানে প্রতিধ্বনি হয়ে অন্য সুরে বাজতে থাকে-গারদে যাও।

স্বাস্থ্য পরামর্শ



গরমের মোকাবিলায় হোমিওপ্যাথি

ডাঃ শতরূপা চট্টোপাধ্যায়
বি. এস. সি, বি.এইচ.এম.এস (ক্যাল)
কনস্যালট্যান্ট, হোমিওপ্যাথ
ফোনঃ 9830075433,9883181542
চেম্বারঃ চকগড়িয়া (কলকাতা), শেওড়াফুলি (হুগলি)

♦ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা খুব সময় সাপেক্ষ-এই ধারণা কি ঠিক?

উঃ কিছু কিছু ব্যক্তির এই বদ্ধমূল ধারণা সঠিক নয়। তবে অনেক দিনের পুরোনো রোগ নিয়ে যখন রোগীরা আসেন, সেক্ষেত্রে রোগ পুরোপুরি সারতে একটু সময় নেয়। কিন্তু সঠিক মেডিসিন খাওয়া আরম্ভ করলে রোগীর কষ্ট কমতে থাকে। প্রথম দিন থেকেই তিনি ফল পেতে আরম্ভ করেন। Acute Disease -এর ক্ষেত্রে যেমন জ্বর, সর্দি-কাশি, পেটের সমস্যা ইত্যাদিতে হোমিওপ্যাথি তৎক্ষণাৎ কাজ করে। সঠিক মেডিসিন এবং Dose প্রয়োগ করলে রোগী সঙ্গে সঙ্গে উপকার পান। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চিকিসকের পরামর্শ খুব জরুরি। আসলে একটি বা দুটি বাজারচলতি বই পড়েই কেউ কেউ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা শুরু করেন। আর তারই ফলস্বরূপ উপরিউক্ত ধারণার উৎপত্তি হয়েছে।

♦ গরমে হজমের খুব সমস্যা দেখা যায়-সমাধানের উপায় কী?

উঃ হ্যাঁ, এটা গরমকালে খুব সাধারণ একটা সমস্যা। নির্দিষ্ট লক্ষণ অনুযায়ী কতকগুলি সমাধানের/চিকিৎসার কথা বলছি।

ক) ভরপেট খাওয়ার পর টক ঢেঁকুর ওঠা, পেট জ্বালা, পেটে প্রচণ্ড গ্যাস হওয়া এসব ক্ষেত্রে Carbo veg খাওয়া যেতে পারে।

খ) রাতে শোয়ার পর হঠাৎ বমি, গলা-বুক জ্বালা, দুর্বলতা এবং বমির পর আরাম বোধ হওয়ায়-Nux Vomica ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া Rubinia, Sulphuric Acid, China, Lycopodium প্রভৃতি মেডিসিন ভালো ফল দেয়।

♦ গরমে বাচ্চাদের ডায়েরিয়া বা অনান্য পেটের সমস্যা খুব দেখা যায়-এক্ষেত্রে কী করণীয়?

উঃ ডায়েরিয়া শুরু হলে প্রথমেই ORS দিতে থাকুন বারে বারে। এছাড়া চিঁড়ে সেদ্ধ, সেদ্ধ ভাত, ডালের জল, ডাবের জল, হালকা চায়ের লিকার এগুলি দিতে থাকুন, যেসব শিশুরা Brest Milk খায় তা বন্ধ করবেন না। এর সঙ্গে কিছু মেডিসিনের কথা বলছি লক্ষণ অনুযায়ী-

ক) পাতলা, সবুজ Stool- Argentum nitricum।

খ) সবুজ Stool সঙ্গে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ এবং বাচ্চা কান্নাকাটি করলে- Chamomilla।

গ) কালচে জলের মতো Stool, খাবারের অনীহা ও প্রচণ্ড দুর্বলতা, এছাড়া মলদ্বারে জ্বালা সঙ্গে বমি হলে- Arsenicum alb।

এছাড়াও Carbo veg, Cina, China, Nux vom, Croton tig ইত্যাদি মেডিসিনগুলি সঠিক লক্ষণের ভিত্তিতে সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করলে তৎক্ষণাৎ ফল পাওয়া যায়।

♦ গরমে সানস্ট্রোক একটা বড় সমস্যা। হোমিওপ্যাথি কীভাবে এর মোকাবিলা করে?

উঃ প্রথমেই আমাদের সানস্ট্রোক উপসর্গ (Symptoms) সম্পর্কে একটু জেনে রাখা দরকার।

i)অনেকক্ষণ রোদে বা খুব ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

ii)ত্বক প্রচণ্ড গরম হয়ে যাওয়া, মুখ লালচে হওয়া, ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া।

iii)অনেক ক্ষেত্রে রোগী মাথা ঘুরে পড়ে যায় কিন্তু জ্ঞান থাকে, সেক্ষেত্রে আবার প্রচুর তেষ্টা পেতে পারে।

iv) হাত-পা কাঁপা, চোখে অন্ধকার দেখা, অসহ্য মাথা যন্ত্রণা ইত্যাদি।

♦ প্রতিরোধ

i) যতটা সম্ভব রোদ এড়িয়ে চলুন।

ii) রোদে বের হওয়ার সময় ছাতা, গায়ে নরম সুতোর জামা-কাপড় ও Sunglass ব্যবহার করুন। সঙ্গে খাবার জল রাখুন।

iii) রোদে ঘোরার সময় খুব ঠাণ্ডা জল বা ঠাণ্ডা পানীয় না খাওয়াই ভালো।

iv) রোদে ঘোরার সময় মাঝে মাঝে রুমাল ভিজিয়ে মুখে ও ঘাড়ে দিন। আর চেষ্টা করুন নাক দিয়েও যাতে গরম হাওয়া কম ঢোকে।

♦ চিকিৎসা

i)Sunstroke হয়েছে এমন ক্ষেত্রে প্রথমেই রোগীকে ছায়ায় নিয়ে যান ও মাথা, বুক, শিরদাঁড়া ও হাতে পায়ে হাল্কা গরম জল দিন। খুব ঠাণ্ডা জল কখনওই নয়।

ii) রোগীর জ্ঞান থাকলে ও জল তেষ্টা থাকলে তাকে স্বাভাবিক উষ্ণ জল দিন। হাওয়া বাতাসযুক্ত স্থানে রোগীকে রাখবেন। রোগীকে স্থিতাবস্থায় আনতে যে হোমিওপ্যাথি মেডিসিন গুলি তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করা হয়, সেগুলি হল- প্রচণ্ড গরম ও শুষ্ক ত্বক, লালচে মুখ,খুব পিপাসায়- Aconite।

চোখে অন্ধকার দেখা, এতটাই দুর্বলতা যে হাত-পা কাঁপতে থাকে, বারবার মূত্রত্যাগ, অসহ্য মাথা যন্ত্রণা- Gelsemium।

গলা শুকিয়ে যাওয়া, ঘুমঘুম ভাব, শ্বাসকষ্ট, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা- Lachesis।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, সারা দেহে প্রচণ্ড ঘাম (বিশেষত, মাথা, গলা, ঘাড়) ও দেহ ঠান্ডা হয়ে যাওয়া- Champhor।

এছাড়া Nat mur, Cactus, Amyl nitrosum, Nat carb ইত্যাদি মেডিসিন ব্যবহার করা যায়। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার এই মেডিসিনগুলি দিয়ে রোগীকে একটু স্থিতাবস্থায় এনে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে বা কাছাকাছি কোনও হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে, কারণ মনে রাখতে হবে সানস্ট্রোক কিন্তু খুব মারাত্মক হতে পারে।

♦ রোদে বেরোলে ত্বকে র‍্যাশ প্রভৃতি সমস্যা দেখা যায়-এর প্রতিকার কী ?

উঃ বেশিক্ষণ রোদে থাকলে ত্বকের বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা যায়, যেমন- ত্বকে র‍্যাশ বের হওয়া, চুলকানি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মেডিসিনগুলি ব্যবহৃত হয়। এই সময় ব্রণর প্রকোপ বাড়ে। এক্ষেত্রে Belladona, Pulsatilla, Borax, Kalibrom, Sulphyr, Heper Sulph প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়।

ত্বকের সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বলব,যতটা সম্ভব গা ঢাকা সুতির জামা কাপড় পরবেন এবং প্রতিদিন জামাকাপড় বদলাবেন। নিমপাতা ফোটানো জলে স্নান খুব উপকারী। হোমিওপ্যাথিক মেডিকেটেড সাবান ব্যবহারে উপকার পাবেন। অত্যধিক ট্যালকম পাউডার ও রোল অন ডিও ব্যবহার না করাই ভালো। সুগন্ধী ব্যবহার করুন জামা কাপড়ে , ট্যালকম পাউডারের অত্যাধিক ব্যবহার রোমকূপ বন্ধ করে ত্বকের র‍্যাশ আরও বাড়িয়ে দেয়। গরমে ফোঁড়ার প্রকোপ বাড়ে। এক্ষেত্রে ত্বক পরিষ্কার রাখাটা খুব জরুরি। আর Belledona, Sulphar প্রভৃতি ওষুধ ভালো ফল দেয়।


Jagari Butique
মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার
১১টায় ও তৃতীয়
বৃহস্পতিবার ১২.৩০
সি.টি.ভি.এন চ্যানেলে
শাড়ির প্রদর্শনী হয়।
কেরালা কটনে অ্যান্টিকের
কাজ, ব্লাউজ পিস সমেত।
প্রো: শ্রাবণী দাস
মো:9038816563,
9477114943
স্টিচ এবং হ্যান্ড পেন্টের মিক্স,
ব্লাউজ পিস সমেত।
পীরতলা দেবেন সেন রোড, আগর পাড়া,

একালের রবীন্দ্রনাথ



শ্রেয়সি রায়

চিনে রেস্তোরাঁয় দু-আঙুলের ফাঁকে কাঠি ধরে গপাগপ খেয়ে ফেলছে যে বাঙালি সে আবার মাছ ভাতে? ছো! ওসব তকমায় উল্টে বাঙালি অপমানবোধ করে এখন। এখন মাছ মিষ্টি অ্যান্ড মোর-এই ইন। নির্দিষ্ট করে কিচ্ছু বলতে হয় না। ওই মোরে এরই মধ্যে দেশি, বিদেশি, তামিল, পাঞ্জাবি যা পাওয়া যায় গুলিয়ে নিলেই হল। এই মোরের লিস্টির অবশ্য সময়ের সঙ্গে সম্পাদনায় কোনও ত্রুটি হয় না। আজকে সুমন, কাল সুচিত্রা, পরশু পিট সিগার, তরশু ডি-ক্যাপ্রি! অন্তত এই কাটাছেঁড়া, সংযোজনের রকমসকম। আর এই তালিকায় অক্লান্তভাবে যিনি সকলের সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছেন মুখ বুজে, তিনি রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালি যাকে সর্বঘটে কাঁঠালিকলা রূপেই মেনে নিয়েছে। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার বাংলা সংস্করণে ওনার নম্বরটি তেত্রিশ কোটি এক। এতে বাঙালিরই লাভ। পাকা দেখায় কিংবা ফুলসজ্জার রাতের আবেগে একান্ত চট করে হাজির হচ্ছেন ঠাকুর। টুক করে সাপ্লাই দিচ্ছেন একখানা গান বা কবিতা। সেই কৃতজ্ঞতাবশত ঠাকুরকে আগলে রেখেছি আমরা। নোবেলপ্রাপ্তির একশো বছর হোক বা নোবেল চুরির পঁচিশ বছর (এখনও এমন কিছু হয়নি তবে শুরু হতে কতক্ষণ?) উপলক্ষ যদি হয় রবীন্দ্রনাথ, চোখের সামনে শাড়ি, পাঞ্জাবি আর ফুলের মালার স্নিগ্ধ সিনে জ্বলজ্বল করবেই। কে বলতে পারে সপ্তাহের রবিবারের তাৎপর্যে হয়তো তার কথা শেখানো হবে নার্সারিতেই। শুধু শহুরে কালচারেই নয়, পোসেনজিতের মফস্সল ও রবিপ্রেমের হেব্বি জোয়ার। ঠোঁট গাঢ় লাল লিপস্টিক, গালে পান পুরে ট্রেকার-ট্রেন-বাস ঠেঙিয়ে ২৫ শে বৈশাখে তারা সটান হাজির হয় জোড়াসাঁকোয়। মুখে গদগদে হাসি, 'কী ভালো লাগছে' । গ্রাম শহরের বেড়া ধুয়ে মুছে তখন রবিবাবুর প্রস্তর মূর্তির নিচে মাঝারি মাপের লাইন। তাতেও ঠেলাঠেলি। লোকাল ট্রেনের অভ্যেস আর কি! সবার হাতে দশ কুড়ি টাকার ফুলের মালা। অনেকেই ছেলে মেয়ের হাত দিয়ে পুণ্য অর্জনে ঘোর বিশ্বাসী। অথচ, তর সয় না। সমানে উশখুশ,হাঁকাহাঁকি, 'একটু হাত চালিয়ে, আমরাও তো আছি' । ভাবখানা এমন 'রবীন্দ্রনাথ কি তোর বাপের সম্পত্তি রে?' গলায় মালা ঝুলিয়ে দেওয়ামাত্র ভক্তদের ঠকাঠক কপালে হাত ঠোকানোর হিড়িক। ফ্রি-তে আর্শীবাদ পেলে ছাড়া যায় বলুন? এদিকে বাড়ির ছেলেমেয়ে যদি পদ্য লিখতে বসে তবে তো 'ইঞ্জিনিয়ার' স্বপ্নের নির্মম হত্যা। যাক গে সে কথা।

দেড়শো বছর পরও যিনি কেতাদুরস্ত বাঙালির ড্রইংরুমের দেওয়ালে নিজের অজান্তে অভিজাত্যের ধ্বজা ওড়ান, তিনি যে বাঙালির অনেকদিনের স্ট্যাটাস সিম্বল, তা আর নতুন কি? শুধু আতিশয্যে নয় তিনি আছেন মধ্যবিত্তের বুক ঠুকে করা রুচিবোধের মস্তানিতেও। আছেন শিল্পবোধে গর্বিত চলচ্চিত্রকারের পাণ্ডুলিপিতে। সদ্য সিনেমা বানানোয় হাতেখড়ি যে পরিচালকদের তার অভাব পূরণে ওনার না নেই। গিনিপিগ হওয়া গা সয়ে গেছে যে। তাঁকে ভালোবাসা জানাতে গিয়ে তার নাটক, উপন্যাস, বড় গল্প, কবিতা ও গানের চর্বিত চর্বণেই বাঙালির অপার আনন্দ।

ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের বাঙালি সুখে দুঃখে চোখ বুজে ঠাঁই নিয়েছে রবীন্দ্রনাথে। সময় ও প্রেক্ষাপট বদলালেও কবিগুরুর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা মূর্খামি। করলে নিন্দুকের কোর্টে সংশয়হীনভাবে বল চলে যাবে। কৃশতা বা ক্লিশতাকে পাত্তা না দিয়ে প্রেমে সেই সখী ভাবনা কাহারে বলে আর বিরহে তুমি সুখ যদি নাহি পাও-এর ট্রাডিশন চলছে। ওদিকে বাছা বাছা রবীন্দ্রসঙ্গীত না গুঁজে দিতে পারলে জনপ্রিয় মেগার আদিবাসী নায়িকার যন্ত্রণা, চল্লিশোর্ধ আর্টিস্টিক মহিলার আর্তি বড় দায় পরিচালক-প্রযোজকদের। একটা বেশ রাবীন্দ্রিক চাদর জড়িয়ে দেওয়াও গেল বাবার করুণায় রসে জবজবে করতে বেশি বেগ পেতে হল না। মন্দা কথা হল, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রবি মহাশয়ের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে বইকি। আশঙ্কা এখানেই। ইলাস্টিকের মতো আমরাই টানছি না তো? পাড়ার ফাংশানে ম্যারাপ বেঁধে মম চিত্তে ও তিনি, আবার রবি নারীরা ফেমিনিস্টি না অতিসাধারণ নমনীয়, সেই সেমিনার,আলোচনা, প্রবন্ধেও তো তিনি। একজন শিল্পীর জন্যে এটা কতটা বেদনাদায়ক হতে পারে তার বিচারে গিয়ে লাভ নেই। আদতে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির চরিত্রে হয়ে উঠেছেন অন্ধের যষ্ঠি। বিষয়ের ঘাটতি পড়লেই যখন তখন স্মরণ করা যায়, আবার গায়কের বাজার





ভালো না গেলে ফটাস করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সিডি বের করে ফেলাটাও হালের ফ্যাশন। এতে অন্তত লোকে তেড়ে গালিগালাজ করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথকে টুইটারে স্মার্ট বাঙালি আপন করেছে যেমন, তেমন রবীন্দ্রনাথকে ঢাল করে পিঠ বাঁচাতেও ব্যস্ত তাদেরই অনেকে।

নিজের সময়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে যিনি এতগুলো বছর পরও সমকালীন, তিনি কালজয়ী। সেখানে আলাদা করে আধুনিকীকরণের প্রয়োজন পড়ে কি? যে অচলায়তন-এ তিনি বিভাজনের বিপক্ষে সরব, যে মুক্তধারা-য় পুঁজিবাদের কাছে মাথা নোয়াতে অরাজি প্রোটাগনিস্ট অভিজিৎ সেখানে কালের শেকল কোথায়? দ্বার তো তিনি খুলেই রেখেছেন। হ্যাঁ এবার অচলায়তনকে বিজেপি তাদের ইস্তাহারে সংযোজন করলে তা আধুনিকীকরণ নাকি রাজনীতিকরণ হবে বলা মুশকিল। পরিপ্রেক্ষিত বদলায় নিজের নিয়মে। কালজয়ী সাহিত্যও তখন জলের মতো আকার নেয়। এইটাই ভবিতব্য।

অতএব, প্রেক্ষাপট, আর সময়ের ব্যবধান কমিয়ে ফেলে একুশ শতকের হরতনি(২০১৩-য় পরিচালক কিউ-এর ছবি 'তাসের দেশ') ফেমিনিজমের বুলি কপচায়। চারুলতা (অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের 'চারুলতা ২০১১') একাকীত্বে হস্তমৈথুন করার সময় ধরা পড়ে যায় শহরের নামকরা ব্যস্ত এডিটর স্বামীর চোখে। বাঙালি আঠেরো বছর বয়স পেরিয়ে গিয়েছে। বলিউড দেখেই হোক বা হলিউড। সে সাবালক। সকলের সামনে চুমুর কথা বলতে গা ঘিনঘিন করে না। দোকানে গিয়ে কন্ডোম চাইতেও রীতিমতো সাবলীল সদ্য প্রেমের মানে বোঝা ছেলেটা। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে তো পিছনে ফেলে রাখলে চলে না। হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসতেই হবে বিবাহপূর্ব যৌনতার সহজ পরকীয়ায়। আশালতা-মহেন্দ্রর যৌনতাকে রোমান্সে মাখামাখি করেন পরিচালক, স্বেচ্ছায়। কিউয়ের তাসের দেশ-এও সোচ্চারে যৌনতার মুক্তির কথা। সেখানেও রাজপুত্র ও সওদাগরপুত্র (অল্টার আগেও বলেছেন সমালোচকরা) ফ্যাসিজিম থেকে মুক্তি পেতে বিপ্লব ঘোষণা করে। সেই যুদ্ধেই ভেঙে পড়বে 'তাসের দেশ'।

বিষয় ও মননের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বদলেছে দৃষ্টিভঙ্গি। সত্যজিতের চারুলতা বঙ্কিম পড়লেও একালে তা ফেসবুক চ্যাটে রূপান্তরিত। চারুলতা, দামিনীদের মাসিক একা থাকার থেকে শারিরিক একা থাকার লড়াই বহু আলোচিত এখন। ঘরে বাইরে-এর বিবাদে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গ আর আসে না। 'বিদ্রোহ' তার সামাজিক সত্তার খোলস ছেড়ে ব্যক্তিসংগ্রামেই আপাতত ঘুরপাক খেয়ে চলেছেন সিনেমাওয়ালারা। রবীন্দ্রনাথকেও অবিরাম ভেঙেচুরে পারমাণবিক শক্তির সন্ধানই চলছে বলা যায়।

আধুনিকীকরণের অমিতের হয়তো মুহূর্তের দুর্বলতায় লাবণ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে আর আটকায় না। পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শুধুমাত্র পাখি দেখার নিরামিষ থেকে থাকাটা আউট অফ ফ্যাশন। লাবণ্যের 'শেষের কবিতা' পড়তে গিয়ে হয়তো অমিতকে ভদকার বোতল নিয়ে বসতে হয়। কেয়ার (কেতকী) সামনে অমিতের বারবার ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ও অনায়াসে উঠে আসবে পোস্ট মর্ডানিজমে। যে হাত ধরাটুকু সেকালে স্বাভাবিক ছিল আজ সেটা একলাফে চুম্বনে যেতে বেশি সময় নষ্ট করে না। সাবালকের দায়ে রবীন্দ্রনাথের অমিত,লাবণ্য ও কেটির কনফ্লিক্টর খোলনলচে বদলায় বটে তবু রবিবারের সাধনা থেকে সাবালকত্ব মেলে না বাঙালির। হ্যাঁ, এই ট্র্যাজেডি। রবীন্দ্রনাথ নামক আরামকেদারা সুয়োদিদির শিল্পচর্চা সেরে ফেলা যায় তবে নেহাত মন্দ নয়।

বিশ্বভারতীয় মনোপলি থেকে ছুটি পাওয়ার পর বটতলা প্রচ্ছদে ঐশ্বর্যের ছবি দিয়ে 'চোখের বালি' —এর চটি বই বের করেছে মনের আনন্দে। নিজের মতো করে রবিঠাকুরের গান গেয়ে কলেজে মাচা কাঁপিয়েছে সদ্য গিটার ঝোলানো শেখ গায়ক। বিশ্বভারতীর দাদাগিরিকে কাঁচকলা দেখিয়ে রবি আদিখ্যেতার সেই শুরু। হরেক বিদেশি যন্ত্রের মেলবন্ধনে, রবীন্দ্রসঙ্গীত রান্না বেশ স্পাইসি। সুবিধে এই যে, কখনওই আর তা রুদ্ধসংগীত হওয়ার সুযোগ নেই। জর্জ বিশ্বাসকে যে চোখরাঙানি শুনতে হয়েছিল তাতে আর কোনও জন ব্রাত্য হবেন না, একেবারে নিশ্চিত। কবি ভদ্রলোককে খামোকা গুরুদেব বানিয়ে অতিরিক্ত দেখানো চোরের দলও বিলুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ যত আষ্টেপৃষ্ঠে ধরবে, মানে আমরা তাঁকে যত জাপটে ধরব ততই নতুন করে তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছে মাথায় গেঁড়ে বসবে। ..মাছের মাথা দিয়ে ডাল তো কাল ডাল মাখানি। নতুন নতুন আঙ্গিকে, আনকোরা সব ব্যাখ্যা,যা কস্মিনকালেও রবীন্দ্রনাথের মাথায় আসত কিনা সন্দেহ, একই গান একসঙ্গে হিন্দি, উর্দু তামিল-এ গেয়ে ফেলা('বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান' উপদেশ মাথায় রেখে)। এমন সুখের ঘর ভেঙে একা থাকার বাসনা চট করে হবে না বাঙালির। দরকার হলে আরও একশো বছর পর পোস্ট পোস্ট মর্ডানিস্ট বাঙালি এও দেখতে রাজি যে, যক্ষপুরী নয়, মঙ্গল গ্রহে পাড়ি দিয়ে প্রাণের স্পন্দন খুঁজে দিচ্ছে বাঙালি। লালগ্রহে ফুটছে রক্তকরবী। বিজ্ঞানীরা করছে হইচই। দিকে দিকে ধন্য কবি ধন্য।



ছবি



আপনার ছবি
দিয়েই সাজতে
পারে পরিণীতা।
তাই ছবি পাঠান
এই ঠিকানায়...

ganaatimp2012@gmail.com



সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, হাওড়া



তাপস কুমার দত্ত, হালিশহর



সারোয়ার হোসেন হালসানা, চাপড়া



অঞ্জলির টাচ গরম কুপোকাত

এই গরমে নর্মাল ও অয়েলি হেয়ার ঠিক রাখতে হলে প্রাকৃতিক পরিচর্যা করুন। প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মাধ্যমেই ত্বকের ও চুলের পরিচর্যা যে আপনাকে কতটা সুন্দর করে তুলতে পারে তারই হদিশ দিলেন অঞ্জলি গাঙ্গুলি।

ড্রাই হেয়ার: এই ধরনের চুল নানানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার মধ্যে প্রধান কারণ সূর্যের আল্ট্রা ভায়লেট এ বি সি। এতে চুলের গোড়ায় খুব ঘাম হয় এবং এটি মারাত্মকভাবে চুলের ক্ষতি করে। সেই কারণে খুব বেশি পরিমাণ জল খেতে হবে এবং চুল দিনে অন্তত দু'বার আঁচড়ে নিতে হবে। ড্রাই চুলের জন্য ভীষণ উপযোগী আমার ভার্টিলাইজার হেয়ার টোন লোশন শিরাম।

যে কোনও হেয়ার ও স্কিন ট্রিটমেন্ট করা হয়। হেয়ার ও স্কিনের যে কোনও সমস্যায় আমরা চিকিৎসা করে থাকি। এই চিকিৎসায় কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। প্রতি সোমবার ও বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে সিটিভিএন চ্যানেলে, রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে চ্যানেল ভিশানও রবিবার দুপুর ১.৩০ মিনিটে সিটিভিএন চ্যানেলে লাইভ প্রো নামে অনুষ্ঠান থাকছে। এছাড়া স্টার জলসা, জলসা মুভিজ ও আমার এফ.এম রেডিওতে আমার অনুষ্ঠান চলছে।

❑ স্পেশ্যালি এই গরমে নর্মাল ও অয়েলি হেয়ার ঠিক রাখতে হলে রিঠা, শিকাকাই ও আমলা জলে ভালো করে ফুটনোর পর ঠাণ্ডা হলে চটকে তার যে নির্যাস বের হবে, সেই নির্যাসের জলটা দিয়ে ভালো করে শ্যাম্পু করতে হবে। এই নির্যাস ব্যবহারে বিশেষ ফেনা হবে না, তবে চুল খুব পরিষ্কার হবে। পাতলা চুল হলে রোজ খাবারের সঙ্গে পাতিলেবু, মুসুম্বি লেবু, কমলালেবু, গাজর, পালং শাক, কলমি শাক ও নটে শাক খাওয়া উচিত। অনেকে জানেন না ধনেপাতা চুলের জন্য খুবই উপযোগী। টাক থাকলে তাদের ক্ষেত্রে ধনেপাতা বাটা একদিন পর একদিন করে লাগিয়ে এক ঘণ্টা রেখে ধুয়ে নিতে হবে। টাকের প্রবণতায় এককোয়া পেঁয়াজের রস লাগাতে হবে।

❑ মহিলাদের ট্রিটমেন্ট করে ন্যাড়া মাথায় চুল এসেছে। পুরুষেরা যাঁরা এখানে এসে ট্রিটমেন্ট করতে পারছেন না, তাঁদেরকে শিউলি পাতা গরম জলে ভিজিয়ে পাতার খসখসে দিক দিয়ে ঘষে (যে জায়গা পাতলা) পেঁয়াজের রস লাগাতে হবে এবং এক ঘণ্টা পরে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

খুব খুশকি হলে আমাদের অ্যান্টি ড্যানড্রফ শ্যাম্পু ও হেয়ার শ্যাম্পু সপ্তাহে তিনদিন ব্যবহার করতে হবে। মেয়েরা চুল শুকিয়ে নিয়ে বাঁধবে, ভেজাচুল বাঁধলে ফাঙ্গাস ইনফেকশন হয়ে চুল উঠবে। যে কোনও হেয়ার ও স্কিন ট্রিটমেন্ট করা হয়। হেয়ার ও স্কিনের যে কোনও সমস্যায় আমরা চিকিৎসা করে থাকি। এই চিকিৎসায় কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।





আইনের বেড়াজালে দত্তক

দত্তকের ক্ষেত্রে আইনের অনেক বেড়াজাল আছে এখানে। সেইসব আইনের কথা পরিণীতার প্রতিনিধিকে জানালেন কলকাতা হাইকোর্টের প্র্যাকটিসিং অ্যাডভোকেট অর্পিতা চৌধুরি।

অর্পিতা চৌধুরি
যোগাযোগ: ৯৮৩০৬০০০৯৩

নিজের সন্তান থাকুক বা না থাকুক দত্তক নেওয়ার ইচ্ছে অনেকের মধ্যেই থাকে। অনেক অবিবাহিতা নারী ও অবিবাহিত পুরুষওএই পথে হাঁটেন। কোনও অনাথ শিশু কিংবা পরিত্যক্ত শিশুকে নিজের লালন পালন করে সমাজিক স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করাকে অনেকে সামাজিক দায় বলে মনে করেন। কিন্তু ইচ্ছে হলেই তা সম্ভব নয়।

■ 'সন্তান' দত্তক নিতে হলে মূলত কী কী আইনের পথে হাঁটতে হয় ?

উ: ১) হিন্দু অ্যাডপশন অ্যান্ড মেন্টেনেন্স অ্যাক্ট, ১৯৫৬।
২) জুভেনাইল জাস্টিস কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন অ্যাক্ট, ২০০০।

■ আইন দুটিতে কী বলা আছে ?

উ: হিন্দু অ্যাডপশন অ্যান্ড মেন্টেনেন্স অ্যাক্ট, ১৯৫৬'-র মাধ্যমে মানসিকভাবে সুস্থ কোনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কিংবা নারী তাঁদের চেয়ে কমপক্ষে ১৫ বছরের কমবয়সি পুত্র বা কন্যা দত্তক নিতে পারেন। এক্ষেত্রে স্বামী - স্ত্রী উভয়েরই সম্মতির প্রয়োজন। তবে স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে কেউ যদি মানসিক ভারসাম্যহীন, ধর্মান্তরিত বা সংসারত্যাগী হন তবে তাঁর অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। যদি কোনও পুরুষ কন্যাসন্তান দত্তক নিতে চান তবে, উভয়ের বয়সের ব্যবধান হতে হবে ২১ বছর। একইভাবে কোনও মহিলা পুত্র শিশু দত্তক নিতে চাইলে উভয়ের বয়সের ব্যবধান হতে হবে ২১ বছর।

এই আইন জম্মু-কাশ্মীরে বলবৎ নেই। খ্রিস্টান, মুসলিম ও ইহুদিরা এই পথে হাঁটতে পারেন না। তবে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, বীরশৈব, লিঙ্গায়ত, প্রার্থনা সমাজ, ব্রাহ্ম বা আর্যসমাজভুক্ত হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকরী।

জুভেনাইল জাস্টিস কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন অ্যাক্ট, ২০০০' -এর মাধ্যমে পরিত্যক্ত শিশুদের কোনও স্বাভাবিক পরিবারের অন্তভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং চিফ জাজের সিদ্ধান্ত মতো শিশুটিকে দত্তক নেওয়া হয়। মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরাও এই আইন বলে দত্তক নিতে পারেন। তবে সমকামীদের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা আছে।

এই অ্যাক্ট -এর মাধ্যমে দত্তক নিতে হলে প্রথমে আদালতে পিটিশন ফাইল করতে হয়। কিছু দত্তক প্রতিষ্ঠান পরিত্যক্ত শিশুদের হাতে পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে হাজির করে। শিশুটি সম্বন্ধে যাবতীয় তদন্তের পর কমিটি শিশুটিকে দত্তক দেওয়ার উপযোগী মনে করলে তাকে দত্তক নেওয়া যায়। শিশুটির বয়স যদি সাত বছরের বেশি হয় সেক্ষেত্রে তার সম্মতির প্রয়োজন এই কারণে যে, সে অন্য পরিবারে বসবাস করতে রাজি কি না।

■ 'সন্তান'একবার দত্তক নেওয়া হয়ে গেলে তা কি বাতিল করা যায় ?

উ: না। দত্তক নেওয়া শিশুটি তার নতুন পরিবারেরই সন্তান হিসেবে বিবেচিত হয়। নতুন পদবি বহন করে। তবে, বাচ্চাটিকে দত্তক নেওয়ার পর দফায় দফায় কাউন্সেলিং চলে। তখন যদি দেখা যায় যে বাচ্চাটি নতুন পরিবারে ভালো নেই, তখন আইনি পথেই সেই দত্তক বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু কেউ নিজের ইচ্ছায় দত্তক সন্তানটিকে প্রত্যাখান করতে পারেন না। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

■ কেউ কি নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে তিনি কন্যা নাকি পুত্র সন্তান দত্তক নেবেন ?

উ: না। এটা ঠিক করে হোম ও কোর্ট। কোর্টে আবেদন করার পর হিয়ারিংয়ের দিন যথাসময়ে কোর্টে হাজির হতে হয় আবেদনকারীকে।কোর্টের কাছে আবেদনকারীকে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, আর্থিক সংগতি প্রমাণ করার পর চলে কাউন্সেলিং। মুখোমুখি হতে হয় পাঁচজনের - লোকাল ম্যাজিস্ট্রেট, সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকোলজিস্ট, লোকাল থানার ও.সি, হোম বা যে সংস্থা দত্তক দেবে তার প্রধান বা যিনি দত্তক দিচ্ছেন তিনি। এঁরাই ঠিক করেন আবেদনকারী দত্তক নেওয়ার যোগ্য কিনা এবং তাঁকে পুত্র না কন্যাসন্তান কি দত্তক দেওয়া হবে।

■ হিন্দু মাইনরিটি অ্যান্ড অ্যাডপশন অ্যাক্ট, ১৯৫৬'-তে দত্তক সম্বন্ধে কী বলা আছে ?

উ: ১৮ বছরের কমবয়সি, ছেলেমেয়ের বাবা-মা উভয়েই মারা গেলে কোর্ট সিদ্ধান্ত নেয় তার ভরণপোষণের দায়িত্ব কে নেবে। এক্ষেত্রে ডিস্ট্রিক্ট জাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'হিন্দু মাইনরিটি অ্যান্ড অ্যাডপশন অ্যাক্ট VIII' অনুযায়ী শিশুটিকে তার বসবাসের প্রতিষ্ঠান বা ভারপ্রাপ্ত অভিভাবকের কাছ থেকে দত্তক নেওয়া যাবে। এক্ষেত্রেও 'হিন্দু অ্যাডপশন অ্যান্ড মেন্টেনেন্স অ্যাক্ট, ১৯৫৬' অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করাতে হবে। বাচ্চাটি আগের পদবি হারিয়ে নতুন পদবি বহন করবে। যিনি দত্তক নেবেন তাঁর পুত্র-পৌত্রাদি থাকলে তাঁকে কন্যা দত্তক নিতে হবে। একইভাবে কন্যা থাকলে নিতে হবে পুত্র।

■ সম্পত্তির ব্যাপারে একজন দত্তক শিশুর কেমন অধিকার ?

উ: পুরোপরি অধিকার। পরিবারের অন্য কোনও সন্তান থাকলে তার যা অধিকার দত্তক সন্তানটিও সেই সমানাধিকার পাবে।

■ দেশান্তর থেকে দত্তক নেওয়া যায়?

উ: নিশ্চয়ই নেওয়া যায়। এক্ষেত্রে স্বীকৃত কোনও অ্যাডপশন প্র্যাক্টিশনার বা মন্ত্রিসভার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডপশন এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের প্রসঙ্গ এসে যায়। খরচ পড়ে২০-৩০ হাজার ডলার বা তারও বেশি।

■ শিশুটিকে কখন জানিয়ে দেওয়া উচিত যে তাকে দত্তক নেওয়া হয়েছিল ?

উ: স্কুলে যেতে শুরু করলে মমতার সুরে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে তার খুব প্রয়োজন ছিল ওই পরিবারের এবং তাকে যেমন আদর দেওয়া হবে, তেমনই শাসন করা হবে। এই অধিকার নতুন বাবা-মায়ের রয়েছে।

অনুলিখন : নবনীতা দাশগুপ্ত

পরবর্তী সংখ্যায় আইনি পরামর্শ বিভাগে বার্ধক্য আইন বিষয়
আপনাদের কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে লিখে পাঠান আমাদের এই ঠিকানায়। ganapatimp2012@gmail.com

তীব্র নিদাঘে মনপসন্দ সরবত

বৈশাখী দাবদাহে সরবত মরীচিকা নয়, সবুজ মরুদ্যান। শুষ্কপ্রাণ জুড়িয়ে যায় সরবতে। রকমারি সরবতের পসার নিয়ে হাজির পরিণীতা এবারের হেঁসেল। এই মরুদ্যানের ছায়াপথে কিছু সময় যাপন করি। তৃষ্ণা জুড়োই সরবত পানে।

অরেঞ্জ জুস ইন ফিউশন তরমুজ



উপকরণ :
৪/৫ স্লাইস তরমুজ ছোট ছোট করে কাটা, এককাপ কমলালেবুর রস, ৪/৫ টা পুদিনা পাতা, চিনি ও আইস কিউব।

প্রণালি:
প্রথমে ছোট ছোট করে কাটা তরমুজগুলোকে মিক্সারে দিয়ে তার মধ্যে চিনি ও ২/৩ টে পুদিনা পাতা দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এবার মিশ্রণটির মধ্যে কমলালেবুর রস ভালোভাবে মেশাতে হবে। তরমুজের জুসের সঙ্গে কমলালেবুর রস ভালোভাবে মিশে গেলে পুদিনা পাতা দিয়ে গার্নিশিং করে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আইস কিউব দিয়ে পরিবেশন করুন।



আপেল বেদানার ফিউশন

উপকরণ:
২টি বড় আপেল, ২টি বড় বেদানা, বিটনুন ও আইসকিউব।

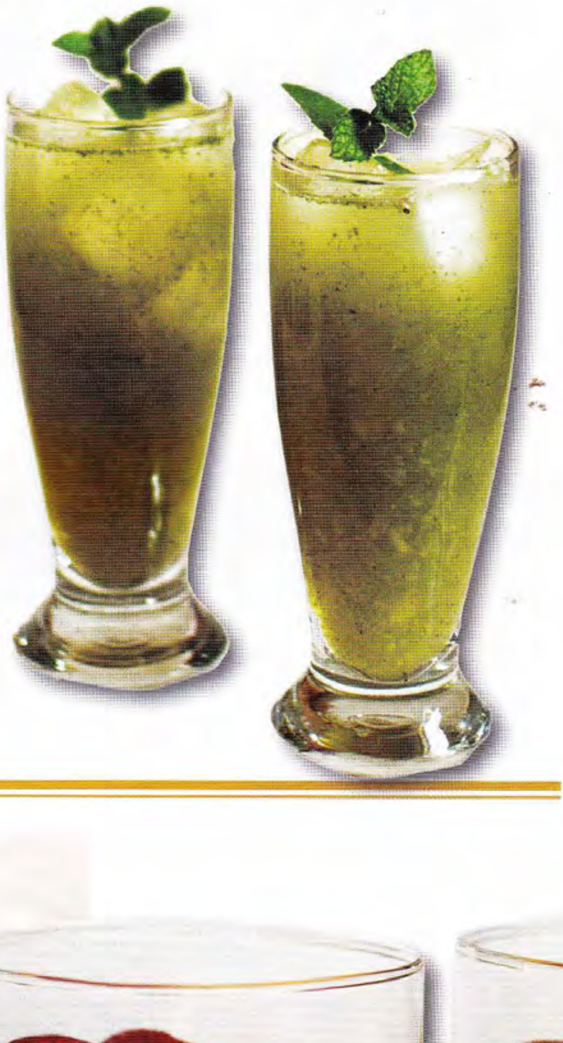
প্রণালী:
প্রথমে আপেলগুলোর খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কাটতে হবে। বেদানার দানাগুলো আলাদা করে ছাড়িয়ে রাখতে হবে। প্রথমে গ্রাইন্ডারে আপেল ও বেদানাগুলোকে তরল মিশ্রণে পরিণত করতে হবে। এরপর স্বাদমত বিটনুন ও আইসকিউব দিয়ে পরিবেশন করুন।



কালো আঙুর সরবত

উপকরণ:
৫০০/৫৫০ গ্রাম কালো আঙুর, বিটনুন, ১ চামচ লেবুর রস ও চিনি।

প্রণালী:
আঙুরগুলিকে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর মিক্সার গ্রাইন্ডারে ভালোভাবে পেস্ট করে নিতে হবে যতক্ষণ না মিশ্রণটি একটি মসৃণ তরলে পরিণত হয়। এরপর গ্লাসে একটু লেবুর রস ও বিটনুন দিয়ে সামান্য কিছু জল মিশিয়ে ঠাণ্ডা আইসকিউব দিয়ে পরিবেশন করুণ। গার্নিশিংয়ের জন্যে পুদিনা পাতা ব্যবহার করতে পারেন।



আমপানা

উপকরণ:
একটি কাঁচা আম, ২/৩ টি এলাচ দানা, ৪/৫ টা মরিচ দানা, ২ টেবিল চামচ বিটনুন, চিনি পরিমাণমতো।

প্রনালী:
প্রথমে কাঁচা আমটিকে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। এবার আমটিকে প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করতে দিন। চার-পাঁচটা সিটির পর দেখবেন আমটি কোমল মণ্ডে পরিণত হয়েছে। এরপর আমটির শাঁস ভালোভাবে তুলে নিয়ে এলাচ গুঁড়ো, নুন, ও স্বাদমতো চিনি মিশিয়ে একটি মসৃণ মিশ্রণ তৈরি করে নিন। ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

পাকা আমের লস্যি



উপকরণ:
২ কাপ কুচো আম, ২ কাপ ঠাণ্ডা দই, ২ টেবিল চামচ ক্রিম, ১/২ টেবিল চামচ এলাচ গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ গোলাপ জল, অল্প জাফরান ও চিনি।

প্রণালী:
আমটিকে প্রথমে ভালোভাবে ছুলে ছোট ছোট টুকরো করে কাটা হল। ব্লেন্ডার বা মিক্সারে টক দই, ক্রিম, এলাচ গুঁড়ো, গোলাপ জল ও জাফরান দিয়ে ভালোভাবে মিশ্রণ করে নিতে হবে। এক মিনিট অবধি মিক্সারটি চালাতে হবে। কারণ দইয়ের সঙ্গে আমটির ভালোভাবে মিশ্রণের জন্যে। স্বাদ বাড়াতে মধুও যোগ করতে পারেন।



ডিজাইনার ডাইনিং

খাদ্যবিলাসী বাঙালির খাওয়ার ঘর নিয়ে উৎসাহ চিরকালীন। একসময়ে রান্নাঘরের পাশে পিঁড়ে পেতে বাঙালি খাওয়া সারতো । তারপর একান্নবর্তী পরিবারের সার বেঁধে দালান জুড়ে খেতে বসা। আজ অবশ্য বাঙালী পাল্টে গেছে, কসমোপলিটেন বাঙালির ডাইনিংও তার রুচির মতো আজ পরিবর্তিত। ডিজাইনার ডাইনিং এবারে সেই স্বাদ বদলে ফেলা সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণের হদিস দিলেন রঞ্জনা মিত্র।

ওপেন স্পেস ডাইনিং: ডাইনিং স্পেস আলাদা করে করার মত যায়গা থাকলে অবশ্যই যেতে পারেন ওপেন স্পেস ডাইনিং প্যার্টানে। সেক্ষেত্রে আলাদা ঘর না থাকলে লিভিং বা বসার ঘরের একটা কোণকেও ব্যবহার করা যেতে পারে ডাইনিং স্পেস হিসাবে। উডেন টেক্সচার ফ্লোর প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়েছে মেঝেতে। আসবাবে একেবারেই সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। গাঢ় মেহগনি পালিশের বড় কাঠের টেবিল আর তার সঙ্গে মানানসই খাঁজ কাটা চেয়ার। টেবিলে সাজিয়ে দিতে পারেন পছন্দের ফুলদানি। মেঝেতে আলাদা করে ফ্যান্সি কার্পেট ব্যাবহার করলে অসাধারণ লুক অ্যান্ড ফিল চলে আসতে পারে পুরো অন্দর সজ্জায়। ছিমছাম সাজেই হয়ে যাবে বসার ঘরের বাজিমাত।

স্মলস্পেস কিচেন কাম ডাইনিং: ছোট ফ্ল্যাটের বড় সমস্যা জায়গা। আলাদা করে ডাইনিং স্পেস বা খাওয়ার ঘর বার করা এখন তাই অনেকের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। কিচেন কাম ডাইনিং তাই এখন ট্রেন্ড। হালকা লেমন ইয়েলো পেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে জায়গাটাকে বড় দেখানোর জন্য। মডিউলার কিচেনে রান্নাঘরের যাবতীয় সরঞ্জাম অ্যাকোমোডেট করে ফেলা যায় খুব অল্প জায়গার মধ্যেই। বাকি জায়গাটাকে তাই অনায়াসেই বানিয়ে ফেলা যায় ছয়জনের বসার উপোযোগী ডাইনিং স্পেশ। মেঝেতে আর ফার্নিচারে ব্যবহার করা হয়েছে কাঠের টেক্সচার। যদিও

প্রত্যেকটি টেক্সচার এখানে আলাদা ব্যবহার করা হয়েছে তবু ইচ্ছে করলে আপনি একই টেক্সচার ব্যবহার করতে পারেন। কাঠের চেয়ারগুলির সাবেকি স্টাইল, মডিউলার ফ্যাশনের কিচেনকে কনট্রাস্ট দিয়েছে। ছোট্ট ফাঁকা স্পেসে ট্র্যাডিশনাল আয়নার ব্যবহার ডাইনিং-এর অন্দরসজ্জায় এনেছে এথনিক লুক।

ফিউশন ডাইনিং: ফিউশান ডাইনিং একেবারেই হাল ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। একইরকমের ট্র্যাডিশনাল অন্দর সজ্জা যদি আপনাকে বোর করে তবে অবশ্যই আপনার অন্দরসজ্জায় আনুন ফিউশনের ককটেল মিশেল। দেওয়ালের গাঢ় রঙের সঙ্গে কনট্রাস্ট করুন সাদার উড ফিনিশ বক্স কভার। জানলার পর্দায় ব্যবহার করা হয়েছে সাদা কালোর ফিউশান। মেঝেতে উডেন টেক্সচার ফ্লোরের উপর রাখা হয়েছে পাতলা ও হালকা রঙের ফ্লোর ম্যাট। ডাইনিং টেবিল ঘিরে থাকা চেয়ারের সেটে দু'ধরনের ডিজাইনের ব্যবহারে তৈরি করা হয়েছে দ্য আর্ট অফ ফিউশন।

বাজেট ডাইনিং: খুব কম খরচে ঘরে রাখা পুরোনো আসবাবে একটু রঙের টাচ দিলেই তৈরি হয়ে যাবে আপনার বাজেট ডাইনিং। আমাদের অনেকের ঘরেই এই ধরনের পুরোনো চেয়ার টেবিল থাকে। সেগুলোকে জড় করে জাস্ট সুন্দর করে একরকম সাদা রঙ করে ফেলুন। চেয়ারের উপর রেখে দিন ছোট ছোট কুশন। কুশন কভার গুলিতে একটু গাঢ় রঙ বা ফ্লোরাল প্যাটার্ন ব্যাবহার করলে দারুণ লাগে দেখতে। আর অবশ্যই ঘরের দেওয়ালে ব্যবহার করুন সবুজ রঙ। মানানসই পর্দা আর তার সঙ্গে ফ্লোরে মাদুর বা চাটাইয়ের ব্যবহার করলে তো কথাই নেই। কম খরচে রেডি আপনার বাজেট ডাইনিং।

আপনার অন্দরমহলটি কিও এরকম ছিমছাম ও সুন্দর। আর দেরি না করে আপনার ঘরের ছবি বা অন্দরসজ্জা সংক্রান্ত নানান টিপস আমাদের পাঠাতে পারেন। আপনার ছবি ও লেখা দিয়েই সেজে উঠতে পারে পরিণীতার আগামী সংখ্যা। লেখা পাঠান:
ganapatimp2012@gmail.com







অমরত্বের খোঁজে

অর্পণ দে

গল্পটা পথ চলতে চলতেই শোনা। কীভাবে বাবা ভোলানাথ তাঁর অমর হওয়ার গল্প শোনাতে চেয়েছিলেন পার্বতী ও গণেশকে, আর তার কী ফল হয়েছিল, হিন্দু ধর্মের আদি অনন্ত এই গল্পের বর্ণনা তোতাকাহিনি নামে ফেরে লাখ লাখ যাত্রীর মুখে। আর এই গল্পের রেশ ধরেই তামাম ভারতবাসী পেয়েছে অমরনাথ যাত্রার মতো এক অকল্পনীয় সুন্দর ভ্রমণ।

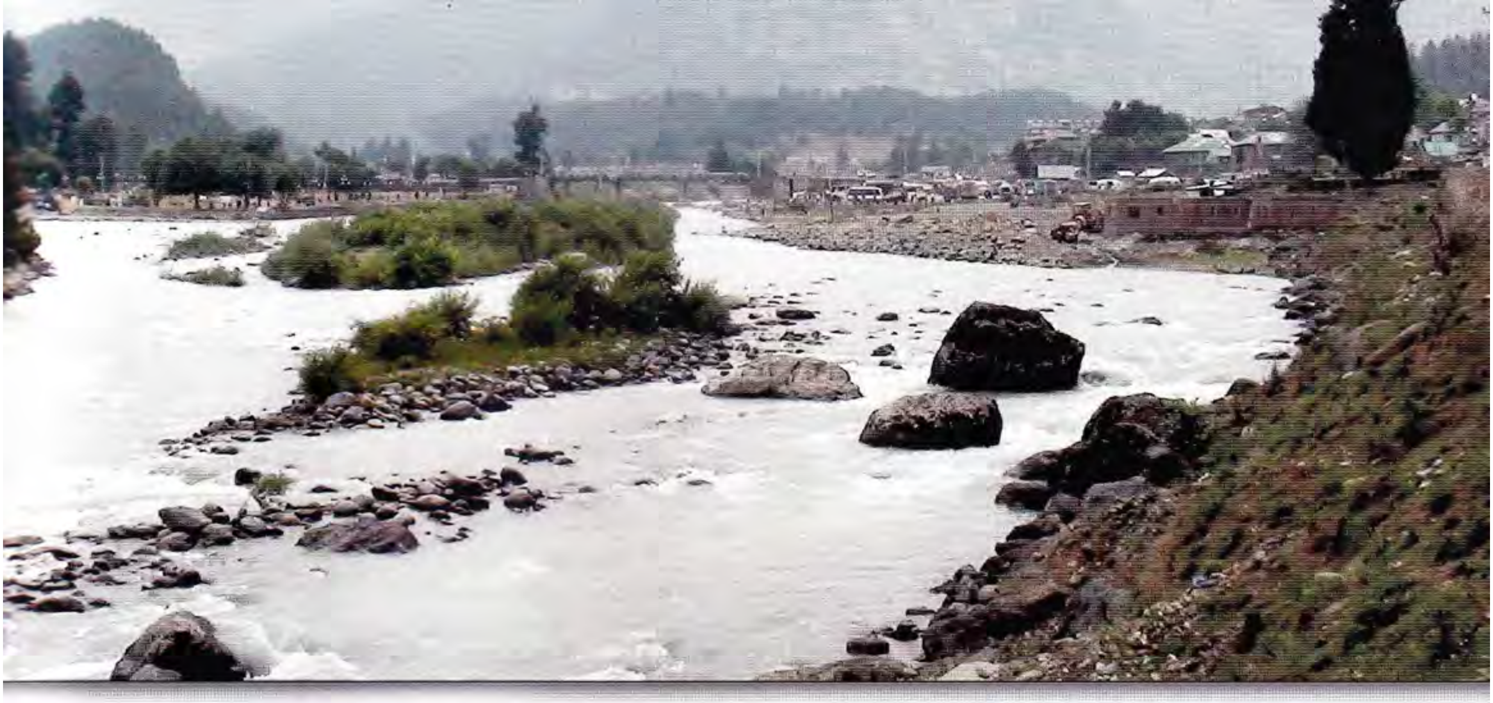
তীর্থ ভ্রমণের সঙ্গে যদি হাড় হিম করা অ্যাডভেঞ্চারের মেলবন্ধন ঘটানো যায় তাহলে সেটাই হবে অমরনাথ যাত্রা। প্রতি বছর জুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে এই পুণ্য তীর্থযাত্রা। শুধুমাত্র ভারতীয়রাই নন, যাত্রাপথের অকল্পনীয় সৌন্দর্যও উপভোগ করতে আসেন বহু বিদেশি। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ মানুষের আগমন ঘটে হিমালয়ের কোলে জমা বরফের দেবতা দর্শনে।

পুণ্যলাভের আশায় কীনা জানি না আমার অমরনাথ যাত্রা সম্পূর্ণ নয়নসুখ লাভের জন্য। আমাদের দশজনের গোটা দলটাই মোটামুটি একই কারণে রওনা দিয়েছিল কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে। কলকাতা থেকে সরাসরি জম্মু যাওয়ার দুটো গাড়ি। হাওড়া থেকে হিমগিরি ও কলকাতা থেকে জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস। সময় কম লাগে বলে বেশিরভাগই হিমগিরি পছন্দ করেন। আমরাও রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে হিমগিরির সওয়ারি হলাম।

হিমগিরি জম্মু পৌঁছলো তৃতীয় দিন বেলা সাড়ে ১২টায়। সেইদিন জম্মু থাকার কথা থাকলেও আমরা রাতেই রওনা দিলাম পহেলগাঁওয়ের দিকে। বারোজনের গাড়িতে দশজনের সফর হল দারুণ আরামেই। জম্মু শহরের সীমানা ছাড়াতেই গাড়ির বৈষ্ণোদেবী আমাদের সঙ্গ দিল কিছুসময়। জম্মু-লে জাতীয় সড়ক ধরে সারারাত গাড়ি চালিয়ে ভোরে বানিহাল টানেল পার করে আমরা ঢুকে পড়লাম কাশ্মীর উপত্যকায়। গাড়ির ভিতরের গুমোট গরমটা নিমেষে জমাটি শীতে বদলে গেল। চারদিকের ধূসর ভাবটাও রং বদলে সবুজ হয়ে গিয়েছে। নীল আকাশের নীচে সবুজ কাশ্মীর উপত্যকা আমাদের স্বাগত জানালো। আরও কিছুটা চলার পর আমাদের পাশে পাশে চলতে শুরু করল বিখ্যাত লিডার নালা।

সাত সকালে নুনওয়ান পৌঁছে ভাড়া করে ফেললাম তাঁবু। দশজনের





ভাড়া মাথা পিছু ৯০ টাকা। সারিবদ্ধ তাঁবুর মধ্যেই আছে খাওয়া, চুলকাটা, ডাক্তার বসার আলাদা আলাদা জায়গা। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে চলছে সব। লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনায় হিন্দুস্থানি ও পাঞ্জাবিরা। খাওয়ার সব কিছুই বিনামূল্যে। তাঁবুতে মালপত্তর রেখে সবাই চললাম পহেলগাঁওয়ে। এখান থেকে ২ কিলোমিটার। প্রথমে লিডারের পাড়ে বসে মন হালকা করে নেওয়া। লিডারের বহতা স্রোতে মিলিয়ে গেল আমাদের আবেগ।

পহেলগাঁওয়ের রূপ অপার। সবুজে মোড়া গোটা শহর। মাথার উপর দিয়ে ঘন ঘন উড়ে যাওয়া হেলিকপ্টারগুলো এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে হারিয়ে যায় চোখের নিমেষে। বাসস্ট্যান্ডের পাশে দু-ভাগে ভাগ হওয়া লিডারের মাঝখানে সাজানো পার্কে বসে কেটে যায় অনেক সময়। পহেলগাঁওয়ের গল্ফ গ্রাউন্ডটাও দারুণ। সব দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে যায়। সন্ধ্যায়ে লঙ্গরে খেয়ে বিশ্রাম। রাতে মুষলধারায় বৃষ্টিতে ঘুম হল দারুণ। খুব সকালে ছড়ি (যারা দৌড়ে দেবতা উপরে নিয়ে যায়) বেরিয়ে যাওয়ার পরে বেরিয়ে পড়লাম আমরাও। নুনওয়ান থেকে বাস মেলে চন্দনবাড়ি যাওয়ার, যেখান থেকে হাঁটা পথের শুরু। পহেলগাঁওয়ের থেকে চন্দনবাড়ির দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার। মাথা পিছু বাস ভাড়া ৭০ টাকা। চন্দনবাড়ি থেকে আমরা যাত্রা শুরু করলাম বেলা একটা নাগাদ।

যাত্রার প্রথম অংশ পিসুটপ। সেনাবাহিনীর নজরদারি পার করে ছোটো হিমবাহের মাথা টপকে পবিত্র এই যাত্রার শুরু ৩৬ থেকে ৪০ কিলোমিটারের (প্রতি বছর কিছু কম বেশি হয়)। ৩ কিলোমিটার খাড়াই। এখানেই যাত্রীদের ক্লান্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে প্রকৃতি। তবে বিকল্প ব্যাবস্থাও আছে। ঘোড়ার পিঠে বা চারজনের ঘাড়ে চড়ে। তাছাড়া লাগেজ অন্যের পিঠে দিয়ে খালি হাতে হাঁটার ব্যবস্থাও আছে। খরচের হিসেবটা আলাদা আলাদা রকম। আমরা চলেছি হাঁটা পথে। পিসুটপে যখন পৌঁছলাম তখন ৪টে। আমাদের ঘড়ি-অনুযায়ী ৪টে বাজলেও রোদ্দুর তখনও বেলা ১টার মতো। এরপর বিশ্রাম নিয়ে পর্বতের গা বেয়ে সারি বেঁধে হেটে চলা। কোথাও পথ কাঠের পাটাতনের মতো সরু, আবার কোথাও বিস্তৃত বরফের চাঁই পথের দু'পাশে। পাশের খাত দিয়ে অক্লান্তভাবে বইছে লিডার। তবে যতই কষ্ট হোক অনন্ত অপার রূপ চোখ জুড়িয়ে দেয়।

কয়েক কিলোমিটার অন্তর অন্তর খাওয়ার জায়গা। যেখানে পাওয়া যায় সব ধরনের খাবার। তবে খাওয়ার ইচ্ছেটা একেবারেই উবে যায়। আমরা পিসুটপের পর প্রথম যেখানে থামলাম সেখানে চা ছাড়া আর কিছু খেতে পারলাম না। অগত্যা আবার পথ চলা। কারণ রাত নামার আগে সকলকে শেষনাগ পৌঁছতে হবে। আকাশ কখনও ঘন মেঘে ঢেকে যায় আবার কখনও মেঘ সরে নীল রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। পর্বতের অন্দরে রাত নামতে নামতে প্রায় সাড়ে ৮টা বেজে গেল। প্রথম দিনের আমাদের গন্তব্য তখনও কিছুটা বাকি। রাত নামতেই উষ্ণতার পারদ নামল দ্রুতগতিতে। পারদ নামার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টের মাত্রাটাও বাড়তে শুরু করল লাফিয়ে লাফিয়ে। চোখেরসামনে তাঁবু দেখা গেলেও সেখানে পৌঁছতে লাগল আরও এক ঘণ্টা। এখানে তাঁবুর ভাড়া জনপ্রতি ১২৫ টাকা।

শেষনাগের জল তখন বরফ শীতল। চারপাশের চূড়াগুলো সাদা বরফে ঢেকে গিয়েছে। আমাদের তাঁবুটাও বরফের উপরে। এখানেও খাবার ব্যবস্থা আছে। লেবু চিঁড়ে খেয়েই রাত কাটালাম আমরা। রাতের আবছা অন্ধকারে জলধারার কলকল আওয়াজ আর ঘোড়াদের চিঁহিঁচিঁহি ডাকে

রাত আরও রমণীয় হয়ে উঠেছে। রাতের অন্ধকারে হিমালয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করল চরম শীতলতা। তাঁবুর ভিতরে কমতে থাকা টর্চের আলো আর বাড়তে থাকা মাথা যন্ত্রণা নিয়ে কেটে গেল সারা রাত।

দ্বিতীয় দিনের গন্তব্য পঞ্চতরণী। সকালে বরফের বিচ্ছুরিত রৌদ্রকে সঙ্গে নিয়ে শুরু পথ চলা। আজকে যাত্রার সব থেকে উঁচু পথ পার করব আমরা, যার নাম মহাগণেশ টপ। উচ্চতা প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার ফুট। স্থানীয় কথায় মহাগুনাস পাস পার করার সময় বৃষ্টি আমাদের সঙ্গ নিল। নুনওয়ান থেকে কেনা ২০টাকার বর্ষাতি পরে চার ফুট বরফের দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের একপাশ থেকে অন্যপাশে নেমে এলাম আমরা। হিমালয়ের এইদিকের উচ্চতা অনেক কম। বরফও অনেক কম। চারপাশে সবুজ আর রঙবাহারি ফুলের শোভা। পরপর এগোতে এগোতে সমতল মাঠে এসে উঠলাম।

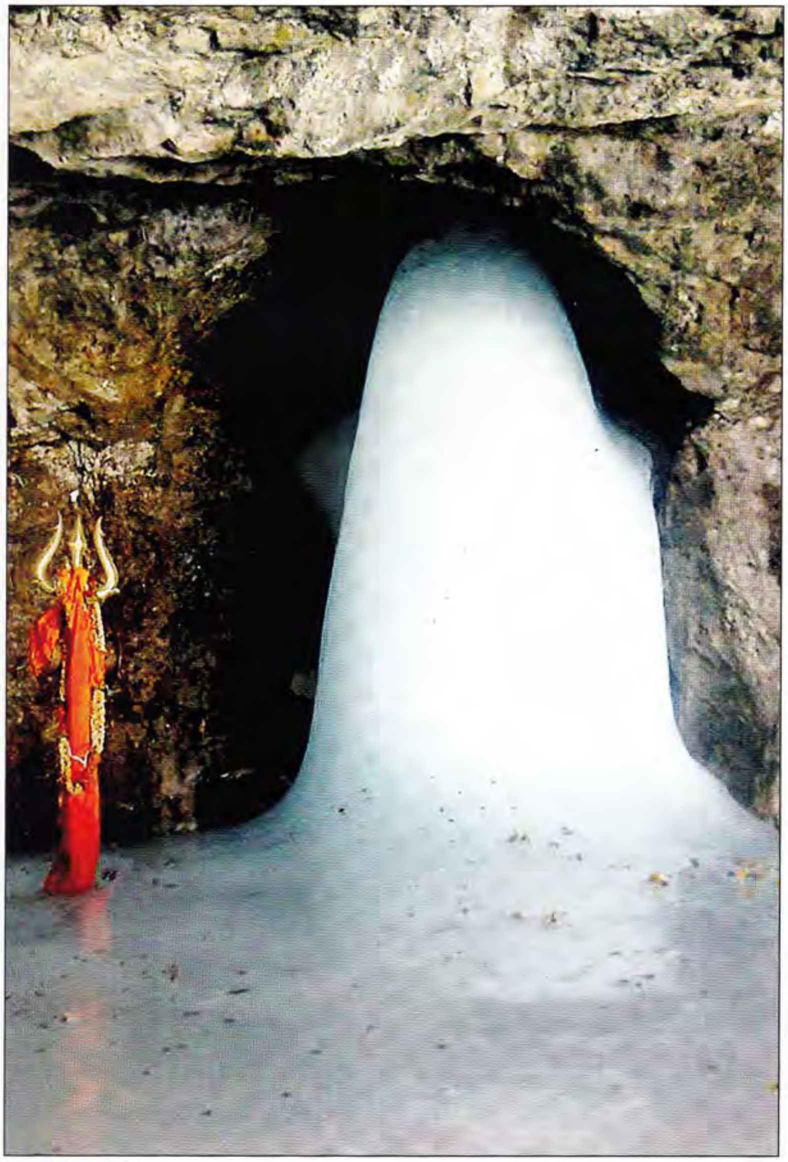
পঞ্চতরণী বা পাঁচ ধারার মিলনস্থল। যাঁরা পহেলগাঁও বা বালতাল থেকে হেলিকপ্টারে আসবেন তাঁদেরকেও পঞ্চতরণীতে আসতে হবে। এখান থেকে ঘোড়া বা ডুলি মিলতে পারে অমরনাথ গুহায় যাওয়ার জন্য। পঞ্চতরণীতে তাঁবুর ভাড়া মাথা পিছু ২২৫ টাকা। এখানে রাতে তুলনামূলক ঠাণ্ডা কম হওয়ায় রাতে খেতে বেরলাম সকলেই। হাজার হাজার তাঁবুর মাঝে হারিয়ে যাওয়ার বড় বেশি সম্ভাবনা আছে তাই নিজের তাঁবুকে চিনে রাখা দরকার।

পরদিন সকাল পাঁচটায় উঠে রওনা দিলাম পবিত্র গুহার উদ্দেশ্যে। ৩ কিলোমিটার যাওয়ার পর এল সঙ্গম। বালতালের পথও মেশে এখানে এসে। সঙ্গম থেকে গুহার দূরত্ব ৩ কিলোমিটার। যেখান থেকে পূজার সরঞ্জাম কিনবেন সেখানেই আপনার ইলেকট্রিক সরঞ্জাম রেখে যেতে হবে। আর পূজার সরঞ্জাম কিনতে হবে কাশ্মীরি মুসলিমদের কাছ থেকেই। সকাল ৯ টায় লাইন দিয়ে গুহায় পৌঁছলাম বিকাল ৫টায়। গুহার মুখে উপর থেকে পড়া বরফ গলা জলে ভিজল আমাদের সারা শরীর। তিনদিনের সব কষ্ট লাঘব কয়েক মুহূর্তে।

১৪ ফুট বরফের শিবলিঙ্গ দর্শন সেরে দ্রুত ফিরলাম। রাতেই নেমে আসতে হবে বালতাল। গুহা থেকে বালতাল ১৪ কিলোমিটার। রাতে বৃষ্টি আর ঘন অন্ধকার সঙ্গে নিয়ে আমরা নেমে এলাম বালতাল। সময় রাত ৩ টে। বিষণ্ণ শরীরে এক লঙ্গরে চা খেয়ে এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে গাড়িতে ফিরে এলাম শ্রীনগর। ভক্তি আর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যে কতখানি পূর্ণ হল তা বোঝাতে পারা অনেক কঠিন। তবে লাখ লাখ লোক বছরের পর বছর কেন হিমালয়ের গভীরে তাদের প্রাণ দেন, তা অনুধাবন করলাম খানিকটা।

মনে রাখার বিষয়

২০১৪ অমরনাথ যাত্রা শুরু ২৮ জুন থেকে। অবশ্যই প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে রাখুন। শ্বাস কষ্ট হতে পারে। কর্পূর অথবা ইনহেলার সঙ্গে রাখা ভালো। অমরনাথ যাত্রার পারমিট করাতে হয় জম্মু কাশ্মীর ব্যাঙ্কের শাখা থেকে। তাছাড়া নুনওয়ানেও পারমিট করানো যায়। খরচ মাথা পিছু ২৫ টাকার মতো। কলকাতায় বিবাদি বাগে জম্মু কাশ্মীর ব্যাঙ্কের শাখা রয়েছে। এছাড়া প্যাহেলগাঁও বা বাল তাল ও শ্রীনগর থেকে হেলিকপ্টার ভাড়ার জন্য শ্রী শ্রী অমরনাথজী শ্রাইন বোর্ডের অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। নুনওয়ানো এর অফিস রয়েছে। হেলিকপ্টারের মাথাপিছু খরচ নির্ভর করে প্যাকেজ টুরের উপর, ভাড়া সাড়ে ১০ হাজার থেকে শুরু। কলকাতা থেকে ১৩১৫১ জম্মুতাওয়াই এক্সপ্রেস সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে জম্মু পৌঁচ্ছাছে তৃতীয় দিন সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে। হাওড়া থেকে ১২৩৩১ হিমগিরি এক্সপ্রেস রাত ১১টা ৫৫মিনিটে ছেড়ে জম্মু পৌঁচ্ছাছে তৃতীয় দিন বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে। জম্মু প্যাহেলগাঁওতে চাহিদা মত হোটেল পাওয়া যাবে তাঁবুর বদলে হোটেলেও থাকতে পারেন।







অরুণাচলের উৎসব, রংবাহারি পোশাক ও অলঙ্কারের প্রদর্শনী

ছবি সৌজন্যে লেখক









অরুণাভ দাস

প্রকৃতি অকৃপণ হাতে সাজিয়েছে অরুণাচল প্রদেশকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈচিত্র্যময় আদিবাসী জীবন ও বর্ণময় সংস্কৃতি। উত্তর-পূর্বের এই প্রান্তিক রাজ্যে অন্তত কুড়িটি উপজাতি এবং অসংখ্য সাব-ট্রাইব বা উপজাতি-উপগোষ্ঠী বাস করে। জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি, ভাষা, পোশাক ও অলঙ্কার সবেতেই তাদের মধ্যে মিল যত, অমিল তার চেয়ে বেশি। যেমন ইদু মিশমিদের কথাই ধরা যাক। পূর্ব অরুণাচলের লোয়ার ও আপার ডিবাং ভ্যালি জেলায় এদের বাস। এদের ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে তিব্বতি, চিনা ও উচ্চ বার্মার জীবনচর্চার সমন্বয় ঘটেছে। ইউনেস্কো ইদু মিশমিদের ভাষাকে বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির ভেতরে অন্যতম বলে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এখন এই ভাষায় মাত্র সাড়ে আট হাজারের কাছাকাছি মানুষ কথা বলেন। ইদু মিশমি উপজাতির প্রধান উৎসব 'রে'। প্রত্যেক বছর ফেব্রুয়ারির শুরুতে লোয়ার ডিবাং ভ্যালির জেলাসদরে রোয়িং তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও অরুণাচল প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে আদি, আপাতানি, বুগুন, লিসু, সিংফো, খামবা, মেমবা, মনপা, নিশি, শেরদুকপেন, টাগিন, খামতি, নকতে, ইয়োবিন এবং ওরানচো ইত্যাদি অনেক বিরলপ্রায় উপজাতির মানুষ বসবাস করেন। এক আকাশের নীচে সবগুলি গোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতি দর্শনের সুযোগ মেলে নামদাফা ফেস্টিভ্যালে। 'রে' উৎসব শেষ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে ফেব্রুয়ারির প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে এই উৎসব তিনদিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বুড়ি ডিহিং নদীর ধারে চ্যাংল্যাং জেলার সদর শহর মিয়াও-তে। এই উৎসবের নামকরণ করা হয়েছে মায়ানমার সীমান্তের কাছে অরুণাচলের বিখ্যাত অভয়ারণ্য ও ব্যাঘ্র প্রকল্প 'নামদাফার' নাম অনুসারে। তিনদিন ধরে লাগাতার চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তার সঙ্গে নৌকা বাইচ, ঘোড়ায় চড়া, তিরন্দাজী, সেরা সুন্দরী প্রতিযোগিতা ও খাদ্য উৎসব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অধিকাংশ উপজাতির প্রধান খাদ্য তোপলা ভাত ও মাছ পোড়া। এবং সাদা ও কালো রাইস বিয়ারেরও ঢালাও স্বাদ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে। স্বাভাবিকভাবেই পোশাক ও অলঙ্কার কেনাকাটার দোকানও বসে অনেকগুলি। একেকটি গোষ্ঠীর সাজ এক এক রকম। পোশাক ও গয়না সবই রংবাহারি ও আকর্ষক। বিচিত্র প্রাকৃতিক উপকরণ যেমন ধনেশ পাখির ঠোঁট, নানারকম পাখির পালক ইত্যাদি যেমন সাজসজ্জায় ব্যবহৃত হয়, তেমনই থাকে অনেক আধুনিক উপকরণ। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এমন আশ্চর্য রঙিন সমন্বয় চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বিশেষত নানারকম ডিজাইনের গয়না আধুনিক শহুরে ফ্যাশনের নতুন মাত্রা অদম্য এই আকর্ষণের যুগে একেবারেই হটকেক।






UTSAV BOUTIQUE
উৎসব বুটিক
৬, ওলাই চণ্ডীতলা রোড, শিব মন্দির কমপ্লেক্স, নিমতা,
কলকাতা-৭০০০৪৯।
মো: ৯৮৩৬৬৩৬০১২
বাংলাদেশের তাঁত
লাল সাদা,
কেটে জুড়ে করা,
মেশিন পার্সি ও
পেটাই জরির কাজ।
ব্লাউজ পিস সমেত।
কেরালা
কটনে হ্যান্ড
আরি স্টিচ ও
পেটাই জরির কাজ,
ব্লাউজ পিস সমেত।



সবুজ ঘাসে

ব্যাটেল ব্রাজিল

অর্পণ দে

তারকা না ফুটবল। নাকি ফুটবলের তারকা। দ্য রিয়েল সাম্বা ম্যাজিক শুরু হওয়ার আগে গোটা ফুটবল বিশ্ব তোলপাড় তারকাদের নিয়ে। মেসি না রোনাল্ডো, নাকি নেইমার কার কপালে বিশ্বকাপ। নাকি এবারের বিশ্বকাপ জন্ম দেবে নতুন তারকার, সেদিকে নজর সকলের। বিশ্বের ৩২টা দেশের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চাক্ষুষ করতে তৈরি গোটা বিশ্ব। তবে অর্থনৈতিক দুর্বলতায় ভোগা ব্রাজিল কি তৈরি ? কয়েক মাস আগে সে দেশের মানুষ ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিলেন। এবার তারা একজোটে বিশ্বকে তাক লাগাতে প্রস্তুত। আসলে যে তাদের রক্তে মিশে আছে ফুটবল।

তবে বিশ্বকাপ আর ব্রাজিলের মাঝে সমস্যা তৈরি করছে স্টেডিয়াম। বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য দরকার ছিল আটটা স্টেডিয়ামের। দেশের ফুটবল উন্মাদনার কথা মাথায় রেখে বারোটা স্টেডিয়াম তৈরির কথা জানান ব্রাজিল সরকার। যা করতে গিয়ে নষ্ট হয় প্রচুর টাকা আর স্টেডিয়ামও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় গোটা দেশে। সরকার নতুন পরিবহন পরিকাঠামো তৈরির কাজে হাত লাগালেও জুনের আগে তাও শেষ হবে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ফিফা। আর গোটা ব্রাজিল জুড়ে দাঙ্গার খবরও আশ্বস্ত করতে পারছে না ফিফা কে। তবে দেশটা ব্রাজিল। মানুষের জীবন শুরু হয় ফুটবল দিয়ে।

তাই যতই দাঙ্গা হোক কয়েক মাস আগে গ্রুপ ড্র হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকেই গোটা ব্রাজিলে শুরু হয়ে গিয়েছিল ফুটবল মহা উৎসব। উপলক্ষ বিশ্বকাপের বল উদ্বোধন। উৎসবের আবহে বিশ্বকাপের বল ব্রজুকাকে সামনে এনেছে ব্রাজিল। ব্রজুকাই বর্ণনা করবে ব্রাজিলের ঐতিহ্য। দেশের ঐতিহ্যবাহী উইশ ব্রেসলেটের মতো ব্রাজুকাতেও রয়েছে নীল সোনালি আর সবুজ রঙের মনকাড়া নকশা। ২০১৪-র ১২ জুন থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত ব্রাজিলে ব্রজুকাই হয়ে উঠবে কারোর বন্ধু তো কারোর শত্রু।

বিবাদ ও বিতর্ক যতই থাক না কেন ফিফা এবং ২০১৪ বিশ্বকাপের সংগঠনের শীর্ষ কর্তারা কিন্তু, ড্র- এর অনুষ্ঠান নিয়ে কোনও কার্পণ্যতা করেননি। ড্র-এর অনুষ্ঠানটি এতটাই জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছে যে বিতর্কের সব আলোকেই দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ৬ ডিসেম্বর ২০১৩ ভারতীয় সময় রাত সাড়ে দশটা নাগাদ (ব্রাজিলের সময় অনুযায়ী দুপুরবেলা) উত্তর পূর্ব ব্রাজিলের বাহিয়া প্রদেশের এক বিলাসবহুল রিসর্টে জমকালো বিশ্বকাপ ড্র অনুষ্ঠিত হয়। পেলে ছিলেন ড্র অনুষ্ঠানের অন্যতম চমক। তবে ব্রাজিলবাসী পেলেকে বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে অপয়া হিসেবে মেনে থাকেন। পেলে ছাড়াও বহু বিশিষ্ট ফুটবলার ও ফুটবল কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে। যার মধ্যে ছিলেন রোনাল্ডো, জিদান, জোয়াকিম লো, ক্লিন্সম্যান ছাড়াও আরও অনেক তারকা।

বিশ্বকাপের ড্র-এর পদ্ধতিটি বেশ আকর্ষণীয়। ড্র-এর জন্য দলগুলিকে চারটি পাত্রে ভাগ করা হয়। প্রথম পাত্রে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত ফিফা র‍্যাঙ্কিয়ের প্রথম সাতটি দেশ থাকে। আর থাকে আয়োজক দেশ। প্রথম পাত্রে ব্রাজিল ছাড়াও ছিল স্পেন, জার্মানি, আর্জেন্তিনা, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, সুইজারল্যান্ড, ও বেলজিয়াম। মূল প্রতিযোগিতার আটটি গ্রুপের শীর্ষ বাছাই দল থাকবে এরাই। দ্বিতীয় পাত্রে ছিল সাত দল। আফ্রিকার পাঁচ ও লাতিন আমেরিকার



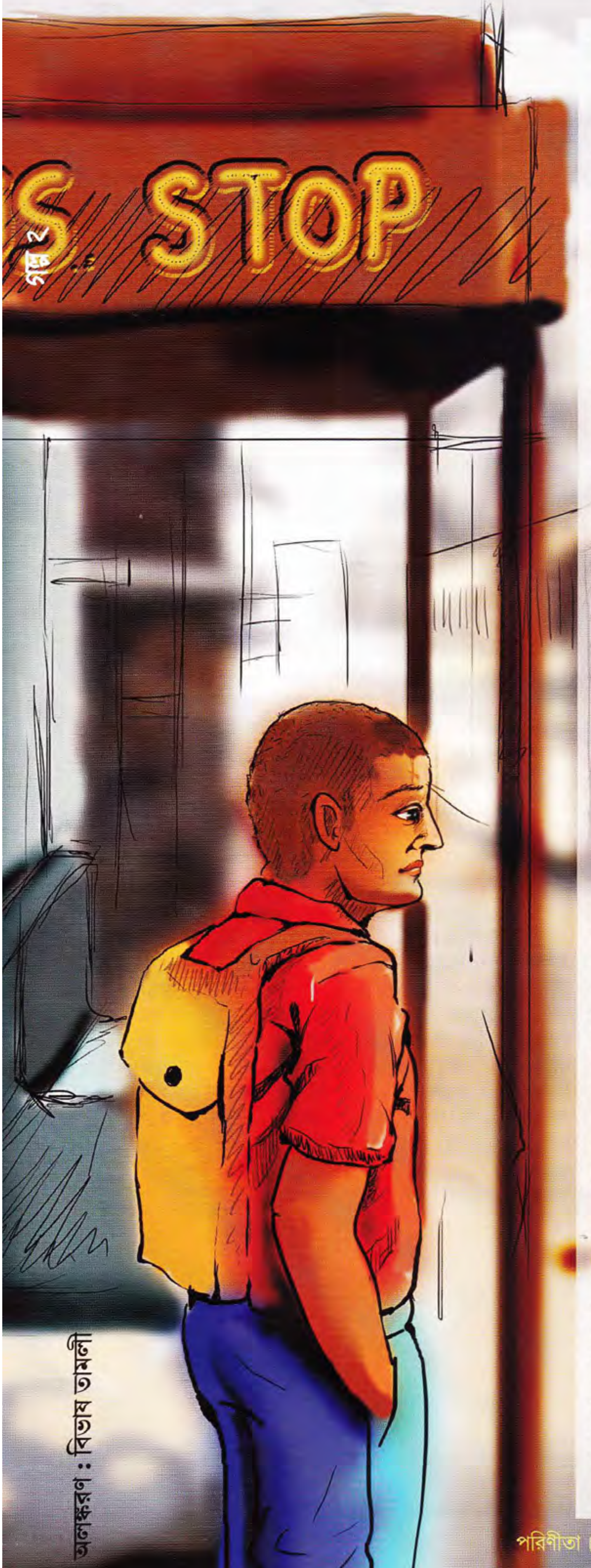
দুই অবাছাই দল। আফ্রিকা থেকে এবার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলগুলি হল আইভোরি কোস্ট, ঘানা, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন। লাতিন আমেরিকার দুই দল চিলি এবং ইকুয়েডর। তৃতীয় পাত্রে ছিল এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা থেকে মূল পর্বে জায়গা পাওয়া আটটি দল। এশিয়া থকে চারটি দল হল জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান ও অস্ট্রেলিয়া। উত্তর আমেরিকা থেকে এবার বিশ্বকাপ খেলবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কোস্তারিকা ও হন্ডুরাস। শেষ অর্থাৎ চতুর্থ পাত্রে ছিল ইউরোপ থেকে মূল পর্বে ওঠা বাকি নয়টি দেশ। এই দেশগুলো হল বসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, ইতালি, নেদারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, ফ্রান্স, রাশিয়া ও গ্রিস।
ড্রয়ের নিয়ম অনুযায়ী ব্রাজিলকে তুলে দ্বিতীয় পাত্রে রাখা হবে আয়োজক দেশ হিসেবে। তারা থাকবে গ্রুপ 'এ' এর শীর্ষ বাছাই দল হিসেবে। আয়োজক দেশ হিসাবে ২০১৪ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচটিও খেলবে ব্রাজিল। তারপর পাত্র থেকে পর্যায়ক্রমে গ্রুপ 'বি' থেকে 'এইচ' এর শীর্ষ বাছাই দলগুলি স্থান পাবে। এবার দ্বিতীয় পাত্র থেকে দল ভাগ হবে। এই পাত্র ভাগ করার সময় লক্ষ্য রাখা হবে দুটো ইউরোপের দল যেন এক গ্রুপে না পড়ে যায়। আর লাতিন আমেরিকার চার বাছাই দলের সঙ্গে যেন চিলি ও ইকুয়েডর একই গ্রুপে না পড়ে। যদি কোনও ভাবে লটারি উঠেও যায় তাহলেও তাদের ভাগ করে দেওয়া হয়।



একইরকম ভাবে ইউরোপের তিনটি দল যাতে এক গ্রুপে না পড়ে তার দিকেও নজর রাখা হয়। অর্থাৎ যদি নেদারল্যান্ড স্পেনের পাত্রে পড়ে যায় তাহলে ভ্যান পার্সি দলকে সরিয়ে দেওয়া হবে অন্য গ্রুপে বা অন্য পাত্রে। এটাকেই বলা হয় 'পট'। আসল ব্যাপার হল একই মহাদেশের দুটি দেশ যেন এক গ্রুপে না পড়ে যায়। তাতে গ্রুপ লিগের আকর্ষণ বেশি কম হওয়ার সম্ভাবনা হওয়ার থাকে। তৃতীয় ও চতুর্থ পাত্রের ক্ষেত্রে গ্রুপিংয়ের ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। এক্ষেত্রেও ওই একটাই বিষয় নজরে রাখা হয়।
যাই হোক বিশ্বকাপের ড্র যে সবাইকে খুশি করতে পারেনি তা বলা বাহুল্য। তা সে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশ হোক বা আমাদের মতন সাধারণ দর্শক। যদি গ্রুপ ধরে আলোচনা করা যায় তাহলেই বোঝা যাবে বড় দলগুলিও সহজে এবার বাজি মাত করতে পারবে না। তাই স্বভাবিকভাবেই জাঁকজমক পূর্ণ ড্রয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হয় বিতর্ক। ফিফার ড্রয়ের পদ্ধতি নিয়ে সমালোচোনা করেন ইতালির কোচ সিজার প্রান্দেলি। তাঁর কথায় যে রেটিং দেখে বিচার হয় তা সঠিক নয়। কারণ ইতালি অন্যতম গ্রুপ অফ ডেথে। গ্রুপ ঠিক হওয়ার পরেই সুইজারল্যান্ডকে পিছনে ফেলে র‍্যাঙ্কিংয়ে সপ্তম স্থানে উঠে এসেছে ইতালি।। সপ্তম স্থানে থাকলে প্রথম পাত্রে আসা উচিত ইতালির। সেক্ষেত্রে তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়ার সম্ভাবনা থাকত ইতালির কাছে।
আর ড্রয়ের পরেই অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে কথার লড়াই। নিজেদের ঘরের মাঠে হলেও ব্রাজিল নয় স্পেনকেই বিশ্বকাপে ফেভারিট হিসেবে দেখছেন কোচ লুই ফিলিপ স্কোলারি। কারণ হিসেবে তার ব্যাখ্যা বিশ্ব ও ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন দলের একক দক্ষতা বাকি দলের ফুটবলারদের তুলনায় অনেক বেশি। এছাড়া তুলনামূলক সহজ গ্রুপে রয়েছে স্পেন। তবে স্পেনীয়রা একথা মানতে নারাজ। কারণ গ্রুপ 'বি' তে স্পেনের সঙ্গে রয়েছে নেদারল্যান্ড, চিলি ও অস্ট্রেলিয়া। নেদারল্যান্ড গতবারের রানার আপ। আর লাতিন আমেরিকায় হওয়ায় চিলি যে নিজেদের শক্তি দেখাবে তা স্পষ্ট। তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ পাচ্ছে আয়োজক দেশ ব্রাজিল। গ্রুপ 'এ' তে তাদের বিরুদ্ধে নামবে ক্রোয়েশিয়া, মেক্সিকো এবং ক্যামেরুন। গ্রুপ এ থেকে অঘটন ছাড়া ব্রজিলের পরের গ্রুপে যাওয়া নিশ্চিত। এই গ্রুপে মূলত লড়াই বাঁকি তিনটি দলের মধ্যে।
বিশেষ নজর রাখতে হবে গ্রুপ 'ডি'-এর দিকে। এটাই বিশ্বকাপের গ্রুপ অফ ডেথ। এই গ্রুপে ইতালির সঙ্গে রয়েছে উরুগুয়ে, ইংল্যান্ড ও কোস্টারিকা। প্রথম তিনটি দলের মধ্যে যে কোনও দুটি দল পরের পর্বে যেতে পারে। ইতালিকে বৃহৎ শক্তি হিসেবে পরের রাউন্ডে নিশ্চিত ধরলে ইংল্যান্ড ও উরুগুয়ের মধ্যে একজনকে প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে যেতে হচ্ছে। তবে ইতালিও যে খুব সহজে পরের রাউন্ডে যেতে পারবে তা অন্ধ ইতালি ভক্তও গলার জোর দিয়ে বলতে পারবেন না।
একইভাবে গ্রুপ 'জি' তেও ভালো লড়াই দেখতে পাবেন ফুটবল ভক্তরা। রোনাল্ডো ভক্তদের কাছে এবারের ড্র মোটেও আনন্দের হয়নি। এই গ্রুপে জার্মানির পরের রাউন্ডে যাওয়াকে আমরা একরকম নিশ্চিত ধরে নিতেই পারি। সেক্ষেত্রে রোনাল্ডোদের যথেষ্ট বেগ দেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই গ্রুপে পর্তুগাল বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচটিই হতে চলেছে অন্যতম নির্ণায়ক ম্যাচ। রোনাল্ডোর পর্তুগালকে পরের রাউন্ডে একেবারে নিশ্চিত ধরে নেওয়া যাচ্ছে না। তবে বাকি গ্রুপগুলোকেও সহজ করে দেখার কোনও কারণনেই বিশ্বকাপের মতন প্রতিযোগিতার সব ম্যাচই রোমাঞ্চকর।
গত কয়েক মাসে বিশ্বফুটবলের যা হালহকিকত তাতে আবার স্পেনকে অন্যতম ফেবারিট মনে হতে পারে। তবে জার্মান ফুটবলেও স্কিল আর তিকিতাকা ইনজেক্ট করেছেন পেপ গুয়ার্দিওয়ালা। স্পেনের দৌড় রুখতে জার্মান কামান তৈরি এবার। আর মেসির আর্জেন্তিনা, নেইমারের ব্রাজিল বা রোনাল্ডোর পর্তুগালের দিকেও তাকাবে তাদের ফ্যানেরা। নজর কাড়তে পিছিয়ে থাকবেন না রিবেরি, রবেন, ফান পার্সি ও ক্লাব ফুটবলের অন্যান্য তারকারা। এশিয়া আফ্রিকার দল গুলিও লড়াই করবে সমানে সমানে। যুদ্ধের ময়দান তৈরি। শুধু অপেক্ষা ১২ জুন বাঁশি বাজার। আর সেই আশা নিয়েই কয়েকটা সপ্তাহের অপেক্ষা। আর হিসেব নিকেশ করা কে হবে ২০১৪-র শাহেনসা।

এক নজরে বিশ্বকাপের গ্রুপ বিন্যাস

গ্রুপ 'এ' - ব্রাজিল, ক্রোয়েশিয়া, মেক্সিকো, ক্যামেরুন
গ্রুপ 'বি' - স্পেন, চিলি, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া
গ্রুপ 'সি' - কলম্বিয়া, গ্রিস, আইভোরি কোস্ট, জাপান
গ্রুপ 'ডি' - উরুগুয়ে, কোস্টারিকা, ইংল্যান্ড, ইতালি
গ্রুপ 'ই' - সুইজারল্যান্ড, ইকুয়েডর, ফ্রান্স, হন্ডুরাস
গ্রুপ 'এফ' - আর্জেন্তিনা, বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা, নাইজেরিয়া, ইরান
গ্রুপ 'জি' - জার্মানি, পর্তুগাল, ঘানা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ্রুপ 'এইচ' - বেলজিয়াম, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, আলজেরিয়া



গল্প ২

আমি আকাশ চৌধুরি এখন একবালপুর রোডের মোড়ে ট্রাম স্টপেজের কংক্রিটের ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে। বয়স কুড়ি, উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। আমি ভবানীপুর আশুতোষ কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পারিনি বলে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

একটু আগে সকাল হয়েছে। চেনা-অচেনা পাখিদের কোরাস গান শোনা যাচ্ছে। কতগুলো ব্রিটিশ কোম্পানির মতো অনেক পাখি এখানে চিরস্থায়ীভাবে আস্তানা গেড়ে বসেছে। কলকাতা শহরের মোহমায়ায় ওরা প্রলুব্ধ।

সদ্য গজিয়ে ওঠা কচি ঘাসের মতো একমাথা চুল প্রমাণ করে, বেশ কিছুদিন আগে আমি ন্যাড়া হয়েছিলাম। আমার কোনও অসুখ ছিল না। বাবার আদ্যশ্রাদ্ধ করার পূর্বে আমাকে চুল ফেলে দিতে হয়েছিল। অথচ এক সময় এই চুল নিয়ে কতই না বায়নাক্কা করেছি। বাজারে নতুন শ্যাম্পু উঠলেই কিনে নিয়ে মাখতাম। পকেটে সর্বক্ষণ একটা চিরুনি থাকতো। রাস্তায় বেরিয়ে পান সিগারেটের দোকান দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়তাম। দোকানের আয়নায় নিজেকে সঠিক পর্যবেক্ষণ করে গন্তব্যস্থানে যেতাম। হিরোর মতো।

ভাবলে অবাক লাগে আমার বাড়ন্ত চুলগুলো অকালেই পেকে গেল। আমার ছোটবেলায় শুধু একবার টাইফায়েড হয়েছিল। তারপর আর কোনওদিন কঠিন অসুখ হয়নি। আমার মুখে মটরশুঁটির মতো অনেক ব্রণ উঠেছে। আমকে দেখলে মনে হবে আমি যেন একটা বহুদিন অযত্নে রক্ষিত ব্রোঞ্জের মূর্তি। মানসিক অশান্তি হয়তো আমার দৈহিক পরিবর্তনের কারণ। তার ওপর ইদানীং আমি খুব টেনশনে ভুগছি একটা ব্যাপারে।

আমি জানি ঘুম থেকে উঠে আমাকে বিছানায় দেখতে না পেয়ে ছোড়দি অবাক হয়ে যাবে। বাড়িতে আমার জন্য ওর মাথাব্যথা সবচেয়ে বেশি। ও অনেক সময় ওর নিজস্ব খাবারের অংশটা আমার থালায় তুলে দেয়। ওর দিকে তাকালে আমার বড় কষ্ট লাগে। পাড়ায় ওর বয়সি সব মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ওর এখনও হল না। বাবা বেঁচে থাকলে এমন হত না। বিয়ে হলে দিদি এতদিনে ছেলেপুলের মা হয়ে যেত। সেই দিদি আজ নীল জিনসের ট্রাউজারের সঙ্গে রোমিও ছাপ মারা লাল গেঞ্জিটা পরতেই বলেছে, যাচ্ছিসতো টিউশনি করতে। তা অত বাহার কিসের? অদিতির প্রেমে পড়তেই বাড়ির লোকজন পাড়ার বন্ধু বান্ধব আমার দিকে কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকায়। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে বাড়ির লোককে আমার হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হয়।

ইদানীং বাড়ির সকলে আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। আমি যেন ওদের কাছে পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমার কথাবার্তায়, চালচলনে নাকি পাগলামির লক্ষণ আছে। বন্ধুরাও আমার হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনে আড়ালে আমাকে পাগল বলে। আমাকে দেখলেই ওদের মস্করার মাত্রা বেড়ে যায়, যা আমার দু'চক্ষের বিষ। কেউ আবার বলে ওঠে—কিরে আজ মিলেনিয়াম পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলি? বলেছিলাম, না চাঁদে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

বন্ধুদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেলার পর বুঝতে পারি আমি ভুল করলাম। তখন হাজার চেষ্টা করেও বন্ধুদের কাছে সুস্থ মানুষরূপে গণ্য হতে পারি না। হাতের ঢিল একবার ছুঁড়ে দিলে যেমন আর ফিরে আসে না ঠিক তেমনি যে কথা মুখ দিয়ে একবার বেরিয়ে যায় তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এই ভুলটা আমার শুরু হয়েছে মাস তিনেক ধরে। সরি, ভুল নয় এটা আমার পাগলামি। এই যে সাত সকালে আমি ঘুম থেকে উঠে এসে একবালপুর রোডের ট্রাম স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছি, এটাও নিছক পাগলামি?

বাবার দেওয়া জন্মদিনের গিফ্ট আমার হাতের ঘড়িতে এখন সোয়া ছটা। আরও পনেরো মিনিট আমাকে এখানে দম দেওয়া কলের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

অলঙ্করণ : বিতান তামলী

ভূকৈলাস রোডের অদিতি

দীপক বসু



ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় অদিতি আসবে। ও রোজ এই সময়ে ভবানীপুরের মর্নিং কলেজে যায়। আজ ওর সঙ্গে আমার শেষ বোঝাপড়া করতে হবে। এতদিন শুধু হঠাৎ চলতি পথে চোখে চোখে বোঝাপড়া হত। কখনও সখনও বঙ্কার চায়ের দোকানে বসে থাকতাম ভিখারির মতো। ওকে শুধু একটু চোখের দেখা—ব্যস তাতেই সারাটা দিন সুন্দর মনে হত। যেদিন ও মনের খেয়ালে আমার দিকে একঝলক তাকায় সেদিন আমি যেন আমির বনে যাই। এক টাকার একটা কয়েন ছুঁড়ে দিই মসজিদের সামনে বসা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিখারির ভিক্ষাপাত্রে। বাড়ি ফিরে সেদিন অদিতিকে নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখে ফেলি। পাঠিয়ে দিই দেশ পত্রিকায়। ছাপা হলে ওকে সারপ্রাইজ দেব।

ঘড়িটার কাচ ময়লা হয়ে গিয়েছে। এই ঘড়িটা আমার জন্মদিনে বাবা আমাকে দিয়ে বলেছিল, খোকা তোকে অনেক বড় হতে হবে। সবাই যখন তোর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠবে তখন সবচেয়ে বেশি খুশি হব আমি। তোর ওপর আমার ভরসা আছে, তুই আমাদের বোস-বাড়ির মুখ উজ্জ্বল করবি। বলেছিলাম, তোমার আশীর্বাদ থাকলে আমি নিশ্চয়ই বড়ো হব। দেখে নিও।

একবার আমার লেখা একটা কবিতা দৈনিক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। বাবাকে ঘিরে মেঝেতে বসেছিলাম।

বাবা বলল, কোথায় গেলে। এ ঘরে একবার শুনে যাও।

মা রান্নার খুন্তিটা হাতে নিয়ে এসে বলল, অত চেঁচাচ্ছো কেন? কি হয়েছে?

বাবা দৈনিক পত্রিকাটা মাকে দেখিয়ে বলল, দেখো খোকার কবিতা বেরিয়েছে। পড়ছি। সবাই মন দিয়ে শোনো।

কবিতাটা ছিল ব্যর্থ প্রেমের। বাবা যখন কবিতাটা পড়ছিল আমার ভীষণ লজ্জা করছিল। কবিতা পড়া শেষ হয়ে গেলে বাবা বলল, খোকা আমার জামার পকেট থেকে দুশো টাকা নিয়ে বাজার থেকে মাংস কিনে এসো। আজ জমিয়ে খাওয়া যাবে।

বাবা এরপর একদিন অফিস থেকে অসুস্থ শরীর নিয়ে বাড়ি ফিরল। প্রথম স্ট্রোক। এস.এস.কে.এম হাসপাতালে ভর্তি করানো হল। দশ দিন পর বাবা মারা গেল। বাবার মুখাগ্নি করার সময় আমি সেদিন দিব্য চোখে দেখতে পেলাম বাবা শ্মশানের চিতা থেকে উঠে এসে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্ছে তুই আমায় কথা দে খোকা, তুই সংসারের দায়িত্ব নিবি। মলি আর জলির বিয়ের চেষ্টা করবি। বাবাকে আমি কথা দিয়েছিলাম।

বাবার মৃত্যুর পর আমি যেন উদভ্রান্তের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। রাস্তায় বেরিয়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটতে থাকতাম। কোথায় যাচ্ছিস কেন যাচ্ছি তার কোনও সঠিক বৃত্তান্ত জানা ছিল না। মুদির দোকানে গিয়ে মুগের ডালের বদলে পোস্ত কিনে নিয়ে আসতাম। আর মাঝে মাঝে আমার অকর্মণ্যতার জন্য মায়ের কাছে বকুনি খেতাম।

রাস্তার সমস্ত চেনা মুখগুলো কেমন যেন অচেনা মনে হত। কোনও সুন্দরী মেয়েকে দেখলে মনে হত ঝরা ফুলের মতো এখনই টুপ করে ঝরে যাবে। পৃথিবীর প্রতিটি জান্তব বস্তুর মধ্যে আমি একটা মৃত্যুর ছায়াকে দেখতে পেতাম। নিজেকে মনে হত আমি যেন একটা পিরামিডের মমি, যে দিনেরবেলা কলের পুতুলের মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। আর রাত হলেই নীরবে পিরামিডের কফিনে শুয়ে পড়ে। এক মাস আগেও আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। ভূকৈলাস রোডের অদিতিকে চোখে পড়ার পর থেকে আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমার বিশ্বাস ওকে একান্ত করে কাছে পেলে আমি আবার জীবনটাকে সুন্দরভাবে ভোগ করব। বাবা মারা যাওয়ার পর এখন ফ্যামিলি পেনশন আর আমার টিউশনির টাকায় আমাদের সংসার চলছে। আমার স্থির বিশ্বাস অদিতিকে কাছে পেলে আমি কলেজের পাট শেষ করে একটা ভালো চাকরি পাব। বড়দি আর ছোড়দির বিয়ে দেব। পলেস্তরা খসে পড়া মান্ধাতার আমলের জীর্ণ বাড়িটার সংস্কার করব। তারপর একটা স্বপ্নের নীড় তৈরি করব।

আমার মিলন উৎসবে পৃথিবীর সমস্ত মৃত মানুষগুলো কবর থেকে উঠে আসবে,শ্মশানের চিতা থেকে উঠে আসবে। সমস্ত অন্ধ মানুষগুলো আবার তাদের দৃষ্টি ফিরে পাবে। পাগল মানুষগুলো আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। আমার কথাবার্তায়, চালচলনে আবার স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে। আমার বাবা চিতা থেকে উঠে এসে আমার কবিতা শুনবে। আমার অকালে পেকে যাওয়া চুলগুলোর আবার কুচকুচে কালো হয়ে যাবে। আমার চোয়াড়ে মুখে মাংস লাগবে। আমার গায়ের তামাটে রং বদলে গিয়ে ফরসা হয়ে যাবে। ছোটবেলায় আমাকে দেখতে নাকি নাদুসনুদুস নাড়ুগোপালের মতো ছিল। আমি আবার সেইরকম নাড়ুগোপাল বনে যাব। অদিতিকে নিয়ে লেখা আমার কবিতা দেশ পত্রিকায় ছাপা হবে।

একটা যাত্রীবিহীন ট্রাম বুনো শুয়োরের মত গোঁ গোঁ শব্দ করে ইস্পাতের মসৃণ লাইনের ওপর দিয়ে চলে গেল। আকাশের ঈশান কোণে একটা শ্রাবণের কালো মেঘ জমেছে। কয়েকটা ধূসর পিঙ্গল বর্ণের কাক ডানা ঝাপটিয়ে সেইদিকে উড়ে গেল। দূরে খিদিরপুর ডক থেকে কোনও জাহাজের ভোঁ শব্দ শোনা গেল। ওর যাত্রাপথ কোথায়? আন্দামান না অন্য কেথাও—কে জানে।

রাস্তার ওপারে অদিতি এসে দাঁড়িয়েছে।

আর অমনি আমার বুকে ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেল। মিলিটারিদের ট্রাকগুলো চলে যেতেই অদিতি রাস্তা পেরিয়ে স্টপেজে এল। কাজল কালো নম্র চোখ দিয়ে আমাকে দ্রুত দেখে নিয়ে মুখ ফেরাল। ও আমাকে দেখল ঠিক যেমন মানুষ, ইট,কাঠ,পাথরের দিকে অবহেলাভরে তাকায় ঠিক তেমনি, অনেকটা না চেনার মতো। এমনটাতো কখনও হয় না। আজ কার মুখ দেখে উঠেছি কে জানে। অর্থাৎ ও আমাকে দেখেও না দেখার ভান করল। আমার উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে কিংবা বলা যায় আমার পৌরুষত্বকে দু'পায়ে মাড়িয়ে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে রানির মতো দাঁড়াল। অভিনেত্রী রাইমা সেনের মতো পোজ দিয়ে।

আজ ওর পরনে সবুজ রঙের একটা শাড়ি, ব্লাউজের হাতটাও সবুজ। কপালের ভ্রূ-সন্ধিক্ষণে সবুজ রঙের টিপ। হাতের ফ্যাশনেবল ব্যাগটির রঙও সবুজ। ও যেন সবুজ প্রতিমা হয়ে আজ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আমার ইহকাল পরকালকে সবুজ করার জন্য। ওর সব কিছুই আলাদা। ওকে কোনওদিন একইরকম ড্রেস পরতে দেখিনি। তবে সবুজ রঙটাই ওর সবচেয়ে ফেভারিট।

যদিও ওর মনের সঙ্গে আমার এখনও যোগাযোগ হয়নি, তবু বলাই বাহুল্য ওর মনটাও সবুজ। আমি একতরফাই ওকে আমার মন দিয়ে বসে আছি উজবুক পাগলের মতো। আমার স্থির বিশ্বাস ওকে কাছে পেলে আমার সমস্ত পাগলামি, অস্থিরতা বলে কিছুই থাকবে না।

অবশ্য অদিতিকে এমন কিছু আহমরি দেখতে নয়। খুবই সাধারণ। চোখ দুটো হরিণের মতো নয়, সাধারণ মেয়ের মতো। দেহের বর্ণ মোটেই ফর্সা নয়। শ্যামবর্ণ বলা চলে। ওর শরীরে এতটুকু মেদ নেই। এইরকম না মোটা না রোগা মেয়েকে হয়তো স্লিম ফিগার বলে। তবুও আমার চোখে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী।

আকাশের ঈশান কোণে একটু আগে যে বর্ষার মেঘকে দেখা গিয়েছিল, এখন আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় উধাও হয়ে গেছে কে জানে? হয়তো বর্ষারানি শহরের জনবহুল জীবন থেকে বিছিন্ন হয়ে কোনও নির্জন স্থানে গিয়ে চোখের জল ফেলছে আমার করুণ দশা দেখে।

এই মুহূর্তে এখানে যদি ঝমঝমিয়ে একপশলা বৃষ্টি হত, তাহলে বেশ হত। আমি আর অদিতি বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচবার জন্য কংক্রিটের ছাউনির তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়াতাম।

আমরা শুধু দুজনে ওখানে থাকবো। চারদিকে মুষলধারে শুধু বৃষ্টি। তখন আমাদের কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। তখন মনে হবে আমরা যেন অনাবিষ্কৃত অন্য কোনও গ্রহের মানুষ। ভগবান আমাদের দু'জনকে এখানে সৃষ্টি করেছেন আদম আর ইভের মতো।

এখানে আমরা প্রাণ ভরে হাসব, খেলব, দু'জনে দুজনকে ভালোবাসব। যখন ইচ্ছে হবে তখন ওকে উপর্যুপরি চুমু খাব। আমাদের মিলনে নতুন মানব সৃষ্টি হবে।

আমরা মরে যাওয়ার পর ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে আমরাই প্রথম মানব ও মানবী। ধুস যত সব আবোল তাবোল কথা আমার মাথায় আসে। একটা অবাস্তব চিন্তা আমার মাথায় ঢুকে প্রায়ই ঘুণপোকার মতো আমাকে কুরে কুরে খায়। আমি বড় কল্পনাবিলাসী। কখনও কল্পনায় আমি ইউরোপের বড় বড় শহরে ঘুরে বেড়াই। আবার কখনও নিজেকে হলিউডের নায়ক মনে করি। আবার কখনও হলিউডের নায়িকা এ্যানজেলিনা জোলির সঙ্গে প্রেম করি। লন্ডনের অ্যালবার্ট হলে কবিতা পাঠ করে হাততালি কুড়োই।

আমি জানি আমার এই কল্পনাবিলাসের জন্য জীবনভর আমাকে ফকির হয়ে থাকতে হবে। হয়তো ভিক্ষে করে পেটের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করতে হবে। হয়তো প্রতিষ্ঠিত বন্ধুদের দরজায় গিয়ে ধরনা দিতে হবে। তবু অবাস্তব স্বপ্ন দেখা থামে কই?

তবু সব কিছু জেনে শুনেও আমি বিছানায় শুয়ে পৃথিবীর দুলর্ভ সুখের স্বাদ অনুভব করি। অথচ পলেস্তরা খসে পড়া আমার নিভৃত কক্ষের শয্যাখানি দেখলে যে কেউ মুখে রুমাল চেপে ঘৃণায় নাক সিঁটকে দু'পা পিছিয়ে যাবে। তেলচিটে দুর্গন্ধময় মাথার বালিশটার রক্ত মাংস মেদ মজ্জা বলতে কিছু নেই। তার বদলে আছে আমার পুরোনো ট্রাউজারের বাতিল অস্থিগুলো। যে কারণে মাথার বালিশটাকে শক্ত ইটের মতো মনে হয়। মান্ধাতা আমলের তুলো বেরিয়ে পড়া তোষকের ভেতর থেকে অবিরাম উঠে আসে মরা ছারপোকার বিটকেল গন্ধ। অথচ কি আশ্চর্য ওখানে শুয়েই আমি অদিতির স্বপ্নে বিভোর হয়ে প্রতি রাতে একটি একটি করে স্বপ্নের সিঁড়ি বানাই।

ফুটপাথে একটা বেওয়ারিশ বাচ্চা ছেলে ঘুমিয়েছিল। হঠাৎ কেঁদে উঠতেই আমার চিন্তার সূত্রটা ছিন্ন হয়ে গেল। অদিতির সামনে এগিয়ে যেতেই আমার বুকটা ধুকপুক করে উঠল। স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে যেতে লাগল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। একঢোক জল খেয়ে নিলে ভালো হত। একবুক তৃষ্ণায় আমার বুকের ছাতি ফেটে চৌচির। জিনসের পকেটে হাত চালান করে দিয়ে রাত জেগে লেখা চিঠিটার অস্বিত্বকে অনুভব করলাম। নীল কালিতে লেখা সমস্ত অক্ষরগুলো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল। আমার ঈষৎ উষ্ণ হাতের স্পর্শে সমস্ত নীল অক্ষরগুলো সজীব হয়ে উঠল। আমি বহু কষ্টে বললাম, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। প্লিজ যদি একটু সময় দাও। অদিতি পাখির নীড়ের মত চোখটা তুলে বলল, বলুন। বললাম, এই চিঠিটা পড়ে দেখো। এতে আমার সব কথা বলা আছে। অদিতি চিঠিটা না নিয়ে বলল, আপনার দিকে মাঝে মাঝে তাকাতাম বলে আপনি হয়তো অন্য মানে করেছেন। বিশ্বাস করুন আপনাকে দেখলে মায়া হয়। এর বেশি কিছু নয়।

আমার বুকে এখন আফ্রিকান নিগ্রোদের ক্যান্তস্তারা পেটানোর শব্দ হচ্ছে। তবু সেই শব্দ ছাপিয়ে বললাম, শুধু কি তাই? তা হলে রাস্তাঘাটে দেখা হলে তুমি আমার দিকে চোখ তুলে তাকাও কেন? এর মানে কী?

অদিতি ভ্রূ প্লাক করা চোখ তুলে বলল, জানেন আপনাকে ঠিক আমার ছোড়দার মতো দেখতে। যে গতবছর ব্লাড ক্যানসারে মারা গিয়েছে। আপনার হাঁটা চলা কথা বলার ভঙ্গি সব ঠিক আমার ছোড়দার মতো।

কিন্তু আমি যে তোমাকে মন দিয়ে বসে আছি তার কি হবে? আমার ভালোবাসার কি কোনও মূল্য নেই? অশ্রুসজল চোখে কথাটা বলে ওর চিবুকের তিলটার দিকে তাকালাম। ওই তিলটাই ওর সৌন্দর্যের বিউটি স্পট।

সরি, আমার কিছু করার নেই। বলে অদিতি দূরাগত ট্রামের দিকে নিস্পৃহভাবে তাকাল।

আমি কিছু বলার আগেই একটা কালীঘাটগামী ট্রাম পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী ভূকৈলাস রোডের অদিতিকে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল।



TAKE ONE

সৌরভ দত্ত



সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে। ত্রেতা যুগের সীতা থেকে কলির দোয়েল, বারবার পুরুষের সামনে অগ্নিপরীক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত নারী। পরিচালক মৈনাক ভৌমিকের নতুন ছবি 'টেক ওয়ান' নারীর এক স্বতন্ত্র পরিচয় ও সেই পরিচয় রক্ষার্থে লড়াইয়ের গল্প। এই সময়ের নামী অভিনেত্রী দোয়েল। দোয়েল খুব ব্যস্ত তাঁর নতুন ছবি নিয়ে, যেখানে সীতার ভূমিকায় অভিনয় করছেন তিনি। কিন্তু হঠাৎই এক সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে তাঁর অভিনীত এক বিদেশি ছবির যৌন দৃশ্য প্রকাশ পায়। রাতারাতি বদলে যায় দোয়েলের জীবন। সকলের প্রিয় অভিনেত্রী এক মুহূর্তে হয়ে ওঠেন পর্ন স্টার। দোয়েলের পর্দার বাস্তবতা পাল্টে দেয় দোয়েলের ব্যক্তিগত জীবন। প্রশ্ন ওঠে দোয়েলের মতো অভিনেত্রী কি সীতার মতো পৌরাণিক ও ধর্মীয় চরিত্রে অভিনয় করার যোগ্য? কিন্তু একই দৃশ্যে অভিনয় করা পুরুষ অভিনেতাকে নিয়ে কোনও আলোচনা হয় না। সমস্ত আলোচনা সমালোচনা আর প্রশ্নের কেন্দ্রে চলে আসে অভিনেত্রী দোয়েলের জীবন। দোয়েল বিধবা। তাঁর একটি এক বছরের মেয়ে আছে। যে মেয়ে দোয়েলের বেঁচে থাকার অবলম্বন। চারিত্রিক পতনের অজুহাতে সেই অবলম্বনকেও সমাজ কেড়ে নিতে চায় দোয়েলের কাছ থেকে। পর্দার সীতা আর বাস্তবের দোয়েল এক হয়ে যায়। আবারও সামাজিক অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হয় নারীকে। শুধু দোয়েলের পাশে এসে দাঁড়ায় এক সাংবাদিক। এরপরের গল্প জানতে হলে অবশ্য আপনাকে দেখতে হবে টেক ওয়ান। ছবিতে দোয়েলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন স্বস্তিকা মুখার্জি। তার পাশাপাশি স্বস্তিকার মেয়ে অন্বেষার আত্মপ্রকাশ ঘটলো এই ছবিতে। এছাড়াও রাহুল, অরিন্দম শীল ও বিক্রমজিৎ চৌধুরি আছেন ছবিতে। সাম্প্রতিক সময়ের অভিনেত্রী পাওলি দামের ছত্রাক ছবির কারণে তৈরি হওয়া বিতর্ক এই ছবির গল্পের মূল অনুপ্রেরণা।

ছবির নির্মাণে মৈনাকের মুন্সিয়ানার কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। দোয়েলের ভূমিকায় স্বস্তিকার অভিনয় নিঃসন্দেহে অসাধারণ। তবে ছবিতে সম্পাদনার কিছু অবকাশ ছিল।

শ্যুটিং শুরু

হিন্দিতে অপর্ণা



গয়নার বাক্স-র পর এবার হিন্দি ছবির পরিচালনায় হাত দিচ্ছেন পরিচালক অপর্ণা সেন। প্রখ্যাত নাট্যকার পরিচালক বাদল সরকারের গল্প নিয়ে তাঁর পরের ছবি 'সারি রাত'। মূল রচনাটির হিন্দি অনুবাদ করেছেন প্রতিভা আগরওয়াল। বৃষ্টির রাতে এক অপরিচিত মানুষের বাড়িতে এক দম্পতির আশ্রয় নেওয়ার গল্প 'সারি রাত'। ছবিতে অভিনয় করবেন অঞ্জন দত্ত, ঋত্বিক চক্রবর্তী ও কঙ্কণা সেন শর্মা। একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে লক্ষ্য রেখে তৈরি হচ্ছে এই ছবি। চলচ্চিত্র উৎসবে তিনজন ভারতীয় পরিচালক ও দুজন পাকিস্তানি পরিচালকের ছবি দেখানো হবে।





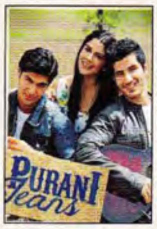
২৮ এপ্রিল থেকে জি বাংলায় শুরু হয়েছে নতুন বাংলা ধারাবাহিক বিবি চৌধুরানি। সোম থেকে শুক্র প্রতিদিন রাত সাড়ে আটটায় দেখা যাচ্ছে নতুন এই ধারাবাহিকটি। এই ধারাবাহিকের গল্প মজার এক কিশোরীকে ঘিরে। যে মুখ খুললেই শুধু মিথ্যে কথা বলে। যেমন তার বাবা চিড়িয়াখানার জমাদার, তার বাড়িতে তিনটে জিরাফ আছে ইত্যাদি। বিবি-র এই উদ্ভট মজায় ব্যতিব্যস্ত বিবির আশেপাশে জড়িয়ে থাকা সমস্ত মানুষ। সত্যি মিথ্যের জাঁতাকলে এভাবেই একসময় হারিয়ে যেতে বসে কিশোরীর জীবন। আর এ সব নিয়েই জমে উঠছে বিবি চৌধুরানি। আপাত মজার এই ধারাবাহিকের মাঝে কিন্তু পরতে পরতে জমে আছে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের ছোট ছোট না পাওয়ার যন্ত্রণাগুলো। কেন বিবি এমন হল? আর কী হবে এই গুলবাজ মেয়েটার ভবিষ্যত এই সব প্রশ্নের উত্তর জানতে গেলে অবশ্যই চোখ রাখতে হবে জি বাংলার পর্দায়।



সুনীপা দাস, বছর কুড়ির ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ২য় বর্ষের এই ছাত্রী ইতিমধ্যেই বাংলা তথা সর্বভারতীয় নৃত্য জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। ডোভার লেন ডান্স অ্যান্ড মিউজিক কম্পিটিশনে প্রথম পুরস্কার, কটক মহোৎসব-এর ন্যাশনাল কম্পিটিশান অ্যান্ড ইনটারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অফ ডান্স অ্যান্ড মিউজিক -এ প্রথম পুরস্কার, সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত ট্যালেন্ট সার্চ-এ ১ম পুরস্কার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার, অরবিন্দ ইন্সটিটিউট অফ কালচার আয়োজিত সংযুক্তা পাণিগ্রাহী মেমোরিয়াল ডান্স কম্পিটিশানে ১ম পুরস্কার, এইরকম অজস্র পুরস্কার সুণীপার ঝুলিতে। দক্ষিণ ভারতের কল্পেশ্বর মন্দিরের শিবরাত্রি উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন। পারফর্ম করেছেন ন্যাশনাল পারফরমিং আর্টস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাষ্ট্রীয় নৃত্য মহোৎসব (গুয়াহাটি)-এ। এছাড়াও সর্বভারতীয় বহু মঞ্চে তার অনুষ্ঠান দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডান্স গ্রুপ ফেডারেশন আয়োজিত স্টারস অফ টুমরোস ডান্স ফেস্টিভ্যাল - এ সুনীপার পারফরমেন্স দেখার জন্য আপাতত মুখিয়ে আছেন কলকাতার দশকেরা।

মুক্তির অপেক্ষায়...

(মুক্তির দিন পরিবর্তন সাপেক্ষ)



পুরানি জিনস

মুক্তির দিন: ১ মে।
ক্যাটাগরি : ড্রামা।
অভিনয়: তনুজ বিরওয়ানি, আদিত্য শীল, ইজাবেল লেইতি।
পরিচালক: তনুশ্রী চ্যাটার্জী।



কোয়েলাঞ্চল

মুক্তির দিন: ৯ মে।
ক্যাটাগরি : অ্যাকশন।
অভিনয়: বিনোদ খান্না, সুনিল শেট্টি, রূপালি।
পরিচালক: আশু ট্রিখা।



দি এক্সপোস

মুক্তির দিন:-২৩ মে
ক্যাটাগরি : ড্রামা/ সোশাল
অভিনয়: হিমেশ রেসমিয়া, ইরফান খান, হানি সিং।
পরিচালক: আননাথ নারায়ন মহাদেবন।



দি অ্যামেজিং স্পাইডার ম্যান ২

মুক্তির দিন: ২ মে
ক্যাটাগরি : ড্রামা/ রোমান্স
অভিনয়: এন্ড্রু গারফিল্ড,এমা স্টোন, জেমি ফক্স
পরিচালক: মার্ক ওয়েব।



এক্স মেন ডে অফ ফিউচার

মুক্তির দিন: ২৩ মে
ক্যাটাগরি : অ্যাকশন
অভিনয়: জ্যাকম্যান, জেমস,জেনিফার, হেল বেরি।
পরিচালক: ব্রায়ান সিংগার।



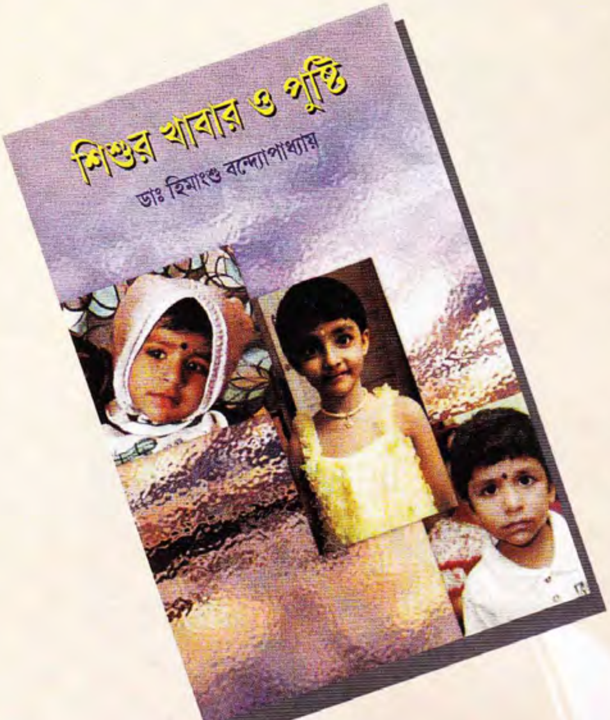
গডজিলা

মুক্তির দিন: ১৬ মে
ক্যাটাগরি : অ্যাকশন
অভিনয়: অ্যারন টেলর,কেন ওয়ান্টানেব,এলিজাবেথ।
পরিচালক: গ্রেথ এডওয়ার্থ



শিশুর খাবার ও পুষ্টি

বিমল দেব



বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই খুবই কম। যা আছে, তা সামান্য হ্যাণ্ডবুক। ঠিক এখানেই, ' শিশুর খাবার ও পুষ্টি' বইটি একটি জরুরি ও অবশ্যপাঠ্য হয়ে ওঠে। ডাঃ হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রথিতযশা শিশুরোগ চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ)। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন এই জরুরি গ্রন্থ। শিশুদের খাবার ও পুষ্টি সম্পর্কে আমাদের দেশের অভিভাবকেরা উদাসীন। কী খাওয়াতে হবে, কেমন করে খাওয়াতে হবে, কেন খাওয়াতে হবে- হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় অসামান্য সহজ ভাষায় লিখেছেন। আসলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ। যা তৃতীয় বিশ্বের মানুষেরা জানেন না বা জানতে চান না । জন্মদাতা হওয়া সহজ কিন্তু প্রকৃত অভিভাবক হওয়া কঠিন। সেকথা ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটি পড়তে পড়তে টের পাই। আরও বুঝতে পারি দেশের ভবিষ্যৎ যারা, সেই শিশুরা কি নিদারুণ অপুষ্টিতে ভোগে আমাদের দেশে। সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন, নিম্ন সাহারা মরুভূমির শিশুদের চেয়েও আমাদের দেশের শিশুরা অপুষ্টিতে বেশি ভোগে। অবিশ্বাস্য হলেও এটা প্রমাণিত তথ্য। এই ভয়ঙ্কর তথ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরামর্শ দিয়েছেন। এবং সেটাই আমাদের পরমপ্রাপ্তি।

'শিশুর খাবার ও পুষ্টি' বইটি গবেষণাধর্মী আকরগ্রন্থ। অনেক পরিসংখ্যান, অনেক সারণি, বহু প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পৃক্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত এই বই।

শিশুর খাবার হিসেবে চিড়ের মাড়, চিড়ের মন্ড যেমন আছে, ইডলি, ভুট্টা, নুডলস, কর্ণফ্লেক্স, প্রকরণ পদ্ধতিও সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন ডাক্তারবাবু। কৌটোর দুধ এবং মায়ের দুধের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিটি খাদ্যের পৌষ্টিকমূল্য উল্লেখ করেছেন। ঘরোয়া খাদ্যের কথা লিখেছেন বিস্তৃতভাবে। যে খাদ্য সহজলভ্য। দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের হাতের নাগালে যেসব খাদ্য পাওয়া যায়, তাতেও পৌষ্টিক মূল্য প্রচুর। এই তথ্যটি ডাক্তারবাবু মনে করিয়ে দিয়েছেন বারবার। ট্র্যাডিশনাল খাবারের যে পৌষ্টিকমূল্য আছে, সেকথাও বারবার বলেছেন ডাঃ হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও আছে জরুরি কথা, শিশুর প্রথম বছরে কিছু সমস্যা ও তার সমাধান। জন্মের পর থেকে ৫ বছরের খাবারের রূপরেখা। আছে সমীক্ষা। এইসব তথ্য প্রজ্ঞার দরোজায় কড়া নাড়ে। একটা বড় ক্যানভাসে সমাজকে দেখতে পাই। ফাস্টফুড সম্পর্কে সর্তকবার্তাও পেতে পারি এই বই থেকেই। আসলে গোটা স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা চিহ্নিত হয়ে যায়। সমাজ সচেতন এই চিকিৎসক আমাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতেও আলো ফেলেন। কর্পোরেট দুনিয়া শিশুর খাবার ও পুষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করার অজুহাতে নির্মমভাবে বাজার দখল করে- এ কথাও বুঝতে পারি এই জরুরি বইটি পড়তে পড়তে।

সত্যি কথা হল, এই বইটি শুধুমাত্র শিশুর মা-বাবার জন্য লেখা নয়, চিকিৎসকদেরও অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। সারা পৃথিবীতে শিশুরোগ চিকিৎসক তুলনায় কম। শিশুর স্বাস্থ্য ও মানসিকতা বুঝতে পারা এক আশ্চর্য ব্যাপার, খুবই কঠিন কাজ। আজকের স্বাস্থ্যপরিষেবা লোভ-লালসা মুক্ত নয়। সর্বত্র দুর্নীতি। শুধু মুনাফা। ঠিক এই রকম সংকটের মুহূর্তে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এক অসম্ভব কাজ করেছেন। অনেকটা 'ভীষণ অসম্ভবে তোমাকে চাই'-এর মতো। সৎ মানবতাবাদী এবং প্রকৃত বিজ্ঞানী চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করেছেন ডাক্তারবাবু। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে চলচ্চিত্র ও সাহিত্যে বিজ্ঞান অবহেলিত। বিজ্ঞানের রেফারেন্স থাকে না আমাদের গল্প ও উপন্যাসে। স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা থাকেইনা। এরকম আকালের দিনে এই বইটি পথপ্রদর্শক। এই বইটিতে অসামান্য সংযোজন, সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্য লিখিত ভূমিকা। নবারুণ ভট্টাচার্য একজন বিজ্ঞানমনস্ক লেখক প্রমাণিত হল এই ভূমিকায়। প্রকাশক উপাসনা ভট্টাচার্য 'প্রকাশকের নিবেদন' এ লিখেছেন সংবেদনশীল কথা। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপক্রমণিকা' বারবার পড়তে হয়।

'সন্দর্ভপ্রকাশ'-এর এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৩ সালের বইমেলায়। খুব হৈ চৈ পড়ে গেছে, এমন নয়। আমাদের দেশে জরুরি বই নিয়ে হৈ চৈ হয়না। যাক সেসব কথা। বইটির প্রচার খানিকটা বেশি হলে, সমাজ উপকৃত হবে। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। ২৪০ পৃষ্ঠার এই বইটির ছাপা ও প্রচ্ছদ খুব ভালো। প্রচ্ছদ শিল্পী পাভেল। প্রচ্ছদের ছবির কম্পোজিশন নয়নশোভন।

শিশুর খাবার ও পুষ্টি: ডাঃ হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্দর্ভপ্রকাশ, দাম : ২৫০ টাকা, ডাক্তারবাবুর দূরভাষ : ৯৮৩০১৮২৩৪৭

লালাট লিখন

মেষ: আধ্যাত্মিকতার চর্চায় মন ভালো থাকবে। তীর্থস্থানে ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ আসবে। ছোট ভাই বোনেদের সময়টা ভালো। চোখ নিয়ে সাময়িক সমস্যা হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় কারণে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। বন্ধু বা কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওনা টাকা ফেরত পাবেন। প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভের যোগ রয়েছে। লেখকরা সম্মান লাভ করবেন।
শুভদিন : ৭,১৭,২৪,৩০।

বৃষ: সাধুদের দান করুন, পুজোয় মনোনিবেশ করুন। অর্থলাভ হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে সময়টা অনুকূল। নিজ প্রতিভায় সুফল পেতে পারেন। শত্রু নাশ হবে। বিদেশ যাওয়ার যোগ আসবে। আগুন থেকে সাবধানে থাকবেন। শরীরে ছোট অস্ত্রোপচার হতে পারে। জমি কিনবেন। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ভালো। কর্মপ্রার্থী কর্মলাভ করবেন। কাজের চাপে মানসিক উদ্বিগ্নতা বাড়বে।
শুভ দিন :-৭,১৪,২১,২৮।

মিথুন: প্রতিপত্তি আপনার করায়ত্ত। জমি জায়গায় অর্থ বিনিয়োগ হবে। মানসিক শান্তির অভাবে শরীর ভালো যাবে না। সাবধানে চলাফেরা করবেন। ডান পায়ে চোট লাগার সম্ভাবনা আছে। শরীর মোটামুটি ভালো যাবে। শুভ গ্রহের কারণে ভাগ্য ভালো থাকবে। মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখুন।
শুভ দিন :- ৫,১৭,২২,২৯।

কর্কট: ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করুন। বন্ধুদের বা বাড়িরলোকজনদের সঙ্গে মতানৈক্য হতে পারে। স্বাভাবিক কাজকর্মের প্রতি নজর রাখার চেষ্টা করুন। সাঁতার না জানলে বিপদের আশঙ্কা আছে। দুশ্চিন্তা যতটা পারবেন কম করুন। কর্মস্থলে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করুন। মনের কোনও আশা পূর্ণ হবে। পেটের ও দাঁতের সমস্যা হতে পারে।
শুভ দিন :- ১,১১,১৯,২৪।

সিংহ: দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। ছোট ভাইয়ের সময়টা খুব ভালো যাবে। সংসারে শান্তি বজায় থাকবে। ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফল লাভ করবেন। দাম্পত্য সুখ গভীর হবে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা খুব ভালো। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের যোগ রয়েছে। পিতার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন।
শুভ দিন :- ২,৯,১৯,২৪।

কন্যা: কোনও নিকট আত্মীয়ের স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। মনের উদারতা বজায় রাখুন। ভ্রমণে নতুন বন্ধুলাভ হবে। অগ্রজের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা। অর্শ বা ফিশচুলায় কষ্ট পাবেন। ছাত্রছাত্রীদের সময়টা ভালো। গান বাজনায়ও সাফল্য লাভ হতে পারে।
শুভ দিন :- ৩,১২,২১,২৭।

তুলা: মাথা একদম গরম করবেন না। শান্ত হয়ে থাকলে উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা ভালো। প্রতিপত্তি বাড়তে পারে। মাথার ব্যথায় ও পেটের ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রার যোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখার চেষ্টা রাখুন।
শুভ দিন :- ৫, ৯,১৮,২৭।

বৃশ্চিক: পারিবারিক ঝামেলায় জড়াবেন না। অর্থ লাভের যোগ প্রবল। শরীরে কোনও ছোটো অপারেশন হতে পারে। পারিবারিক সহযোগিতা লাভ করবেন। শান্তি বজায় থাকবে। কাছাকাছি কোনও আত্মীয়ের বিবাহের যোগ রয়েছে। ছেলে-মেয়ের পরীক্ষায় ভালো ফল লাভের আশা।
শুভ দিন :- ৫,১২,১৭,২৩।

ধনু: পুলিশ, ব্যাঙ্ক কর্মী ও জীবন বিমা কর্মীদের সময়টা ভালো। অংশীদারী ব্যবসায়ে মতানৈক্য হতে পারে। ভ্রমণের যোগ রয়েছে, তাই খরচ বাড়তে পারে। কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসতে পারেন। তাই পদোন্নতির সম্ভাবনা। উচ্চস্থান থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়ার প্রবল যোগ রয়েছে। সাবধানে কাজ করার চেষ্টা করুন। বিয়ের যোগ রয়েছে।
শুভ দিন :- ৫, ১২, ১৯, ২৬।

মকর: সময়টা মিশ্র। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। পরিশ্রমে বিশ্বাসী হন। মানসিক চাপের সম্ভাবনা রয়েছে। কাজের মধ্যে থাকার চেষ্টা করুন। তাহলে মন ভালো থাকবে। অর্থ আসবে। বাবা-মায়ের শরীর ভালো যাবে। ভালোবাসার মানুষেরা নানারকমের সুযোগ সুবিধা দেবেন। ব্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। সন্তানের কৃতিত্বে গৌরববোধ করবেন।
শুভ দিন :- ৭,১৩,২৩,২৯।

কুম্ভ: স্নায়বিক রক্তচাপ ও পেটের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থান নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। ঋণ পরিশোধের পর আরও অর্থ আসবে। সময়মতো খাওয়া দাওয়া করার চেষ্টা করুন। মহিলা কর্মচারীদের শুভ সময়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোনিবেশের প্রয়োজন আছে। দাম্পত্য জীবন ভালো যাবে।
শুভ দিন :- ২,৭,১৯,২৪।

মীন: রিসার্চ স্কলারদের সময়টা খুব ভালো। সর্দি, কাশি ছাড়া শরীর মোটামুটি ভালোই যাবে। সাংসারিক জীবন ভালো যাবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। মনের জোরে সাফল্য লাভ করবেন। পাওনা টাকা পেয়ে যেতে পারেন।
শুভ দিন :-৫,১১,১৭,২৬।


অনবদ্য গিটারিস্ট
রঘুনাথ ব্যানার্জী
চিরকালীন রবীন্দ্রসুর।
সুর আবহে বাংলা গানের
স্বর্ণালীদিন। হৃদয়মথিত
হিন্দি গানের নস্ট্যালজিক সুর।
ফাংশান এবং ঘরোয়া
অনুষ্ঠানের জন্য যোগযোগ
করুন ফোনঃ
৯৯০৩৫৪৮০০৫
৯৮৩৬৮১৮৮৬৩
AUDIO CD
তুমি রবে নীরবে
ইলেকট্রিক গীটারে
রঘুনাথ ব্যানার্জী
ELECTRIC GUITAR...
AUDIO CD
আমি যে জলসা ঘরে
ELECTRIC GUITAR
RAGHU NATH BANERJEE
রঘুনাথ ব্যানার্জী
ইলেকট্রিক গীটারে
AUDIO CD
রবীন্দ্র ভাবনায়
ইলেকট্রিক গীটারে
রঘুনাথ ব্যানার্জী
ELECTRIC GUITAR
AUDIO CD
OLD IS GOLD
A premium Collection of Melody
রঘুনাথ ব্যানার্জী
ELECTRIC GUITAR
ইলেকট্রিক গীটারে
RAGHU NATH BANERJEE

নতুন বছরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ASHIRWAD BANQUETS

A CENTRALLY AIR CONDITIONED BANQUET HALL

FOR MARRIAGES, RECEPTION, SANGEET, TILAK, BIRTHDAY, ANNIVERSARY & CONFERENCES ETC.







Lift Available



SAYAN

Ground Floor-6000 sq ft.
For 50 to 3000 Persons







SANHITA

1st & 2nd Floor-12000 sq ft.
For 300 to 1500 Persons

www.ashirbadbanquet.com

37/4, KALABAGAN, DUMURJALA (OPP. HOWRAH INDORE STADIUM) HOWRAH 711104

Phone:033-2667 0304 Mob no:9874204536/9732712377/9002598666